বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

সেপ্টেম্বর ◆ ২০২৪

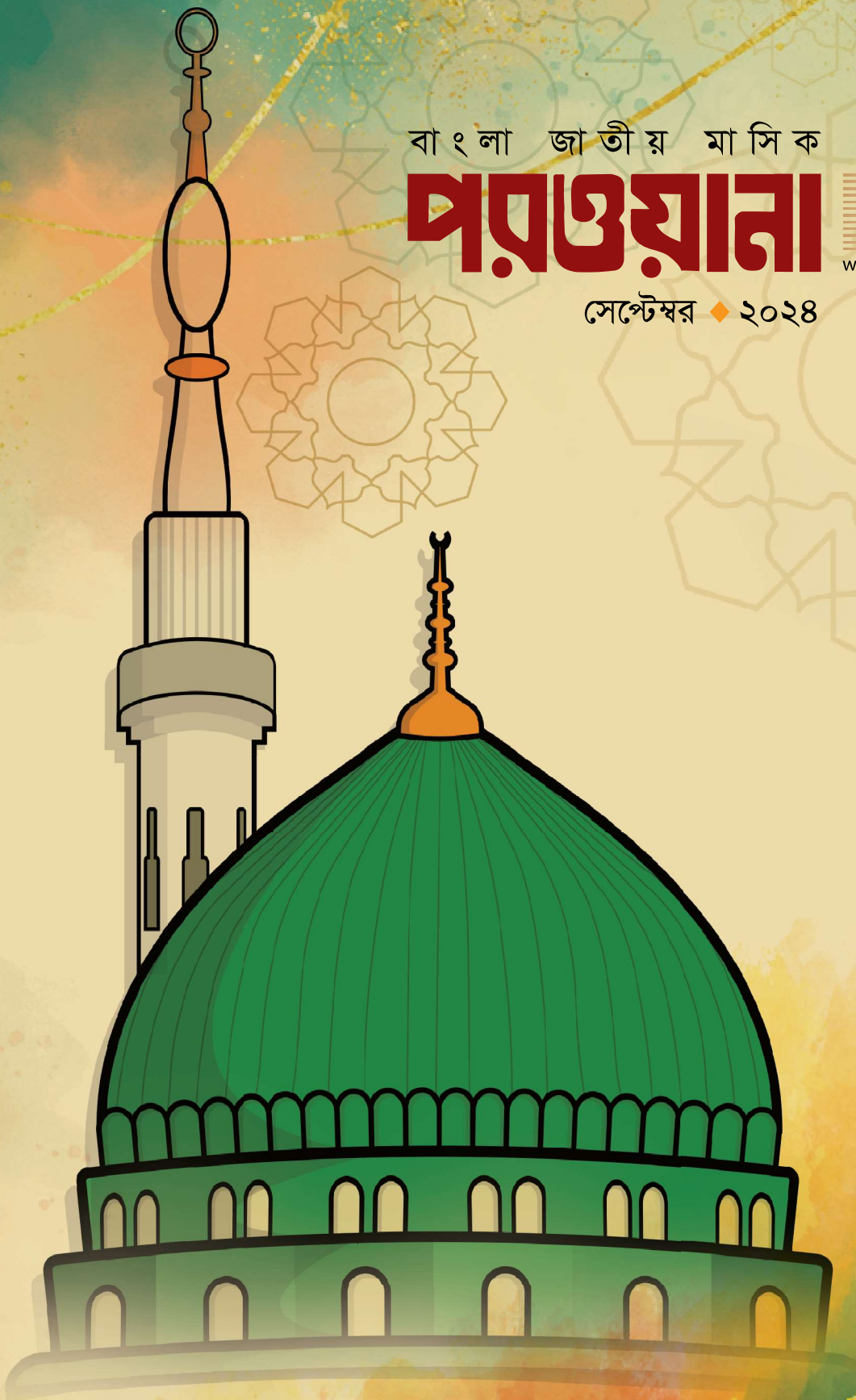

বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

৩১তম বর্ষ ■ ৮ম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০২৪ ♦ ভাদ্র-আশ্বিণ ১৪৩১ ♦ সফর-রবীউল আউয়াল ১৪৪৬

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মুখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

বিভাগীয় সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি

সহ-সম্পাদক
মনজুরুল করিম মহসিন
মো. মাহমুদুল হাসান

বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থাপক
এস এম মনোয়ার হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
আহসান মাহমুদ

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ৩৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

শারহুল হাদীস
আল্লাহর ওলীদের সাথে শত্রুতার পরিণাম/মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৫

প্রবন্ধ
শবে মীলাদের মু'জিযা/ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) ০৭
হাদীসের আলোকে প্রিয়নবী ﷺ এর মর্যাদা/আল্লামা ইউসুফ ইবন ইসমাঈল আন নাবহানী ১২
রাসূল ﷺ এর কিছু বৈশিষ্ট্য/সায়্যিদ মুহাম্মদ ইবনু আলাভী আল মালিকী (র.) ১৪
শাশ্বত দ্বীন : লয় নাই ক্ষয় নাই নাশ নাই যার/মাওলানা রূহুল আমীন খান ১৬
আজকের বাংলাদেশ : ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা/মারজান আহমদ চৌধুরী ১৮
প্রজন্ম জেড : বিপ্লব যাদের রক্তে মেশা/হায়দার ইবনে মোকাররাম ২১

আন্তর্জাতিক
মার্কিন নির্বাচন এবং মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ট্রাম্প-কমলার রাজনীতি/রহমান মুখলেস ২৭

মসনবীর গল্প
যে দেশে বাদশাহ নিজে ভিখারি খোঁজে/ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ২৯

নিয়মিত
এই মাসে এই চাঁদে ৩২
জীবন জিজ্ঞাসা ৩৩
এক নজরে গতমাস ৩৬
কবিতা ৩৮
আবাবীল ফৌজ ৪১
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

نحمده ونصلى على رسوله الكريم– اما بعد



মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ সকল যুগের মানুষের হিদায়াতের দিশারী হয়ে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর সে কারণেই তাঁর পবিত্র সীরাত প্রতিটি যুগে একই রকম প্রাসঙ্গিক, কখনোই সে প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কোন ধরনের যৌক্তিক সংশয় দেখা দেয়নি। আমাদের এই উত্তরাধুনিক যামানার নতুন নতুন সংকট মোকাবেলার ক্ষেত্রেও আমরা তাই নবীজির ﷺ জীবনাদর্শে খোঁজে পাই অমূল্য দিকনির্দেশনা।

বিখ্যাত পোলিশ দার্শনিক জিমুন্ত বাউমেন উত্তরাধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন 'লিকুইড মডার্নিটি'কে, কেননা তরল পদার্থের যেমন নির্দিষ্ট কোন আকার নেই, উত্তরাধুনিক সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্যই হলো এ যুগের মানুষ কোন পরম সত্য কিংবা পবিত্র বস্তু বা আদর্শের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। আদর্শিক দৃঢ়তা এ যুগে বিলুপ্তপ্রায়, শক্তিশালী সামাজিক বা নৈতিক মানদণ্ডের কোন অস্তিত্ব নেই এই উত্তরাধুনিক সভ্যতায়। উত্তরাধুনিকতার এই আদর্শিক শিথিলতার ফলে দেখা দিয়েছে নানা ধরনের অস্থিরতার, আধুনিকতার খপ্পরে পড়ে মুসলিম সমাজেও এই কথিত লিকুইড মডার্নিটির প্রভাব পড়ছে, নৈতিক মানদণ্ড ভুলে সমাজের নৈতিক-অনৈতিক সবকিছুকে একই দৃষ্টিতে বিচার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে মানবপ্রকৃতি বিরুদ্ধ বিভিন্ন বিষয়ও এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা বা অন্ততপক্ষে ছাড় পাচ্ছে, যুক্তি হিসেবে বলা হচ্ছে ঐ লোকের এই কাজ যেহেতু সরাসরি আমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে না, অতএব তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না, তাকে তার মতো চলতে দিতে হবে।

এই নৈতিকতা বিবর্জিত ব্যক্তি স্বাধীনতা আর লিকুইড মডার্নিটির যুগে একজন মুসলিমের প্রকৃত পথপ্রদর্শক হতে পারে সীরাতে নববী, আমরা মহানবীর জীবনাদর্শে খোঁজে পেতে পারি আমাদের পথের দিশা। ন্যায়বিচার, সহানুভূতি এবং সততার উপর তিনি যেভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন, তার বিপরীতে আধুনিক কথিত নৈতিক মানদণ্ডের দূর্বলতা খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। উত্তরাধুনিক মননে ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিকতা নিয়ে যে দ্বিধা দেখা দিতে পারে, নবীজির সীরাত অধ্যয়ন সে দ্বিধা থেকে মুক্তির পথ দেখায়।

আমাদের সময়ে একদিকে যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলা হয়, অন্যদিকে তার আড়ালে চলে ব্যক্তিকে বস্তু হিসেবে কিংবা আরো স্পষ্ট করে বললে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করার মতো ঘৃণ্য চর্চা। মানুষ এই ভোগবাদী সভ্যতার চোখে কেবলই পণ্য, ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে সেই পণ্যকে পুঁজিপতিদের জন্য আরো লাভজনক করে তোলার প্রয়াস এখানে স্পষ্ট। এর বিপরীতে নবীজির জীবনাদর্শ অনুসরণ করলে আমরা জানতে পারি মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং মানব সত্তার পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের কথা। মহানবী ﷺ তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি মানুষের সাথে মোয়ামালার ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে তার উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে রেখে গেছেন। একেবারে প্রান্তিক মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের সর্বোচ্চ মানুষটি পর্যন্ত প্রত্যেকের যে মানবিক মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব রয়েছে, মানুষ যে কেবল বস্তু কিংবা পণ্য নয়, অবজেক্টিফিকেশনের এই যুগে মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে নবীজির জীবন থেকে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। মহানবী ﷺ এর পবিত্র সীরাত অধ্যয়ন করলে অজস্র ঘটনা আমরা দেখতে পাই যা আমাদেরকে ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে।

উত্তরাধুনিক সভ্যতার আরেকটি অস্তিত্বের সংকট হচ্ছে নৈতিক নেতৃত্বের সংকট। এ সভ্যতা যেহেতু বস্তুবাদী সভ্যতা, আধ্যাত্মিকতা যেহেতু এখানে অনুপস্থিত কিংবা সমাজের জন্য অগুরুত্বপূর্ণ নিছক ব্যক্তিগত বিষয়, তাই নৈতিক নেতৃত্ব এ সভ্যতায় দুর্লভ। এ সভ্যতায় সমাজবিজ্ঞানীরা স্বীকার্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন দুর্নীতি থাকবেই, যথাসম্ভব এটিকে কমিয়ে আনতে হবে, শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এ সভ্যতায় প্রায় অসম্ভব বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এর বিপরীতে নবীজির জীবনাদর্শ এবং তার পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনাদর্শ আমাদের জন্য একেবারে ভিন্ন নজির, নেতৃত্বের সর্বোচ্চ শিখরে ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ঠিক কীরূপ হতে পারে; জবাবদিহিতা, স্বার্থহীনতা এবং নৈতিকতার বিচারে নেতৃত্বের রূপ কেমন হওয়া উচিত তার জন্য উত্তরাধুনিক সভ্যতার জন্য মহানবী ﷺ এর রেখে যাওয়া জীবনাদর্শ অবশ্য অনুসরণীয় এবং শিক্ষণীয়।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক উত্তরাধুনিক সভ্যতায় সামাজিক বন্ধন ও মূল্যবোধের অবক্ষয় চরম আকার ধারণ করেছে। একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজে সামাজিক বন্ধনের ধরন কী হবে, সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ব ও অধিকার কী হবে, সেটি কীভাবে নিশ্চিত করতে হবে, এ সকল বিষয়ে উত্তরাধুনিক সভ্যতার ধারণা কেবল অস্পষ্টই নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে সেটি অসম্পূর্ণও বটে। সামাজিক সম্পর্কের বহু প্রশ্নে এ সভ্যতা নিরুত্তর, কেবল ব্যক্তির স্বাধীনতা আর ভোগবাদের দিকেই সকল গুরুত্ব। এর বিপরীতে একজন মুসলিমের জন্য স্পষ্ট, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সামাজিক বন্ধন ও মূল্যবোধের নির্দেশনা পাওয়া যায় মহানবী ﷺ এর জীবনাদর্শের মধ্যে। ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা ও বৃহত্তর স্বার্থে সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং মূল্যবোধের যে শিক্ষা মহানবীর জীবনাদর্শে আমরা পাই, এর অনুপস্থিতিতে মানুষ শুধু ইসলাম থেকেই বিচ্যুত হচ্ছে না, বরং মানব সভ্যতাই অস্তিত্বের সংকটে পড়ছে।

সর্বোপরি উত্তরাধুনিকতার এই অস্থির সময়ে সুস্থ, স্বাভাবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গঠনে মহানবী ﷺ এর জীবনাদর্শ অধ্যয়ন ও তাঁর শিক্ষার বাস্তবায়ন অপরিহার্য। এই যুগের সকল দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমাধান পেতে সীরাতের শিক্ষার দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া মানবজাতির সামনে আর কোন পথ নেই। মহানবী ﷺ এর জীবনাদর্শকে এড়িয়ে আধুনিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে মুসলিম সমাজে যে অস্থিতিশীলতা ও অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাধানের জন্য আমাদেরকে নবীজীবনের শিক্ষায় ফিরে যেতে হবে। এমনকি অমুসলিমদের মধ্যেও যে সামাজিক বন্ধনহীনতার সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে মানব সমাজের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিচ্ছে তার সমাধানের জন্যও ধর্মনির্বিশেষে মানবসমাজকে অনুসরণ করতে হবে মহানবী ﷺ এর মহান জীবনাদর্শকে। আসুন প্রিয়নবী ﷺ এর আগমনী মাস রবীউল আউয়ালেই রাসূল ﷺ এর মহান জীবনাদর্শ চর্চায় দৃঢ় প্রতয়ী হই।

আত্ তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ– وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ– كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ– فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ–

অনুবাদ: যেখান হতেই তুমি বের হও না কেন মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তা নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন। তুমি যেখান হতেই বের হওনা কেন মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তার দিকে মুখ ফিরাবে। যাতে তাদের মধ্যে যালিমদের ব্যতিত অপর লোকের তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কিছু না থাকে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না। শুধু আমাকেই ভয় করো। যাতে আমি আমার নিআমত তোমাদেরকে পূর্ণরূপে দান করতে পারি এবং যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হতে পারো। যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করেন। তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন আর তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেন। সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৪৯-১৫৩)

তাফসীর:

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা لِكُلٍّ শব্দ ব্যবহার করে আহলে মিল্লাতের প্রতি ইশারা করেছেন এবং وِجْهَةٌ শব্দ ব্যবহার করে কিবলাহ বুঝিয়েছেন।[১]

আর فَاسْتَبِقُوا শব্দ দ্বারা سارعوا (তাড়াতাড়ি কর) অর্থ বুঝিয়েছেন।[২]

প্রত্যেক আহলে মিল্লাতের জন্য পৃথক পৃথক এক একটা কিবলাহ রয়েছে। আর সেদিকে সে মুখ করে। সুতরাং তোমরা আমলে সালিহ করার জন্য দ্রুত চল। তোমরা যেখানেই মৃত্যুবরণ করো না কেন, সেখান হতে তোমাদেরকে উঠানো হবে এবং কিয়ামতের দিন একত্রিত করা হবে। একথা জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

মূলতঃ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন, ভালো কাজে দেরি করতে নেই। তোমরা তাড়াতাড়ি কাবাকে কিবলাহ বানিয়ে নাও এবং আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করে জীবনে প্রতিফলন করো, যেভাবে পূর্ববর্তীরা দেরি করে এবং দ্বিধা সংশয় সৃষ্টি করে অনেক কিছু হারিয়েছিল। তাদের মত দেরি করো না।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি যেখান হতেই বের হন না কেন, নামাযের সময় আপনার চেহারা কাবার প্রতি রাখুন। কারণ এটা আল্লাহর নির্দেশ, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি যেখান হতেই বের হন না কেন, আপনার চেহারা মুবারক মসজিদে হারামের দিকে করুন। যেখানেই তোমরা থাকো না কেন তোমরা তোমাদের চেহারা মসজিদে হারামের দিকে করো, যেন কেবলমাত্র যালিমগণ ছাড়া অন্য লোকেরা তোমাদের সমালোচনা করতে না পারে। তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো, যেন আমি তোমাদেরকে আমার নিআমত দান করতে পারি। তাহলে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।

এখানে لِلنَّاسِ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে আহলে কিতাবের একটি দলকে। যেমন কাতাদাহ ও হযরত রবী (রা.) বলেন لِلنَّاسِ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে আহলে কিতাব। তারা বলেন, যখন রাসূল ﷺ কাবার দিকে কিবলাহ ফিরালেন, তখন আহলে কিতাবদের নিকট তাদের পিতার এবং সম্প্রদায়ের কিবলাহ ছেড়ে কাবার দিকে মুখ ফিরানো খুবই কষ্টকর হয়েছিল।[৩]

ইয়াহুদীরা বলছিল, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীরা কিবলাহ সম্পর্কে অজ্ঞাত। আমরাই তাদেরকে কিবলাহ সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছি। তারা কিবলাহর ব্যাপারে আমাদের অনুসরণ করে অথচ আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বিরোধীতা করে। ইহাই ছিল তাদের যুক্তি বা দলীল, যা রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থাপন করতো।[৪]

হযরত ইবন জুরাইয (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আতা (রা.)কে আল্লাহ তাআলার বাণী لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ সম্পর্কে বললাম। তিনি জবাবে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কাবাকে কিবলাহ নির্ধারণ করলেন এবং অন্যদেরকেও তার নির্দেশ দিলেন, তখন কুরাইশরা বলতে লাগল, মুহাম্মদ ﷺ তো আমাদের অমুখাপেক্ষী নন। কারণ তিনি আমাদের কিবলাহ গ্রহণ করেছিলেন এবং কিবলাহ বানিয়েছিলেন। এটাই ছিল তাদের দলীল। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের এরকম বলাটা খুবই অন্যায়। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, কুরাইশরা বলতে লাগল রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কিবলাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং শীঘ্রই আমাদের ধর্মের প্রতিও প্রত্যাবর্তন করবেন।[৫]

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উপরোক্ত আয়াতের মর্মকথা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা এ আশঙ্কা করো না যে, আমি তোমাদেরকে তাদের ধর্ম মতের প্রতি ফিরিয়ে দেবো; বরং আমি তোমাদেরকে আমার নিআমত পরিপূর্ণ করে দেবো। তা দ্বারা তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি যেকোনো দেশ বা শহর হতে বের হয়ে আসেন না কেন নামাযে আপনার মুখ কাবাগৃহের দিকে রাখবেন। হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনাদের চেহারা মসজিদের হারামের দিকে রাখুন এবং মসজিদে হারামকেই কিবলাহ হিসেবে গ্রহণ করুন। যেন মুশরিকীনে কুরাইশ ছাড়া কেউ তোমাদের নিকট দলীল পেশ করতে না পারে। কিবলাহ পরিবর্তনের নির্দেশ এজন্য এসেছে, যেন আমি তোমাদেরকে ইবরাহীম (আ.) এর কিবলাহর দিকে পথ দেখিয়ে আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করতে পারি, যে ইবরাহীম (আ.)-কে আমি মানবকুলের ইমাম নিয়োগ করেছিলাম। কিবলাহ পরিবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল তোমাদেরকে 'মিল্লাতে হানাফিয়্যা' অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতের নিদর্শনমালা পরিপূর্ণ করে দেওয়া, যে শরীআতের প্রতি আমি নির্দেশ প্রদান করেছিলাম নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা (আ.) সহ সকল নবীগণকে। আর এ নিআমত প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, তিনি রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম ও মুমিনদেরকে পরিপূর্ণ নিআমত প্রদান করবেন।

وذلك هو نعمة التي اخبر جل ثناه انه متممها علي رسوله والمؤمنين من اصحابه كي ترشدوا الصواب من القبلة–

অর্থাৎ এটাই আল্লাহর নিআমত, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরামকে পরিপূর্ণরূপে দান করার কথা বলছেন। যাতে তারা কিবলাহ সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা পায়।[৬]

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

-যেভাবে আমি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের নিকট তোমাদের হিদায়াতের জন্য রাসূল প্রেরণ করেছি। তিনি তোমাদের কাছে আমার প্রেরিত আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেন এমন কিছু, যা তোমরা জানো না। অর্থাৎ তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে তোমাদেরকে শিরক ও মন্দ চরিত্র হতে পবিত্র করেন। তিনি তোমাদেরকে কুরআন এবং হাকীকতে কুরআন শিক্ষা দেন, যার মাধ্যমে তোমরা আম্বিয়াদের কথা, কাহিনী ও পূর্ববর্তী উম্মতদের কথা জানতে পারো, যা তোমরা জানতে না।[৭]

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখব। আমার শুকরিয়া আদায় করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। হে মুমিনগণ! তোমরা আমার আদেশ পালন করতঃ আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে আমার শুকরিয়া আদায় করো-এ কারণে যে, আমি তোমাদেরকে দ্বীন ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দান করেছি। আমার নিআমত এবং ইহসান অস্বীকার করো না। যদি তা হয়, তাহলে জেনে রাখো তোমাদের থেকে তা আবার ছিনিয়ে নেবো।[৮]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

হে ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ! তোমরা সবর এবং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। অর্থাৎ তোমরা বিজয় লাভের জন্য কষ্টকর হলেও ধৈর্য্য ধারণ কর। হতে পারে এ কষ্ট কিবলাহ পরিবর্তনের পর শত্রুদের সমালোচনা ও অপবাদের কারণে অথবা নিছক শত্রুতার কারণেও হতে পারে বা আল্লাহর আনুগত্য করতে গিয়ে শরীরের উপরও হতে পারে। অবশ্যই আল্লাহ ধৈর্য্যধারণকারীর সাথে রয়েছেন। কারণ আল্লাহ সাহায্যকারী; কিন্তু তা প্রকাশ করেন তার বান্দাহের আমলের মাধ্যমে।[৯]

১. তাবারী, ৩/১৯২; ২. তাবারী, ৩/১৯৬; ৩. তাবারী, ৩/১৯৯-২০০; ৪. তাবারী, ৩/২০০; ৫. তাবারী, ৩/২০১-২০২; ৬. তাবারী, ৩/২০৭-২০৮; ৭. তাবারী, ৩/২১০-২১১; ৮. তাবারী, ৩/২১১; ৯. তাবারী, ৩/২১৩;



আল্লাহর ওলীদের সাথে শত্রুতার পরিণাম

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

হাদীসের মূল ভাষ্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: "مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ". رواه البخاري.

অনুবাদ: হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, যে আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি বান্দার উপর যা ফরয করেছি আমার নিকট তা থেকে অধিক প্রিয় এমন কোনো বিষয় নেই যা দ্বারা বান্দা আমার অধিক নৈকট্য অর্জন করতে পারে। আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমেও আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি তাকে ভালোবেসে নেই। যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে, আমি তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকট কোনো কিছু চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। যদি সে আমার নিকট আশ্রয় চায় তাহলে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দান করি। (বুখারী, হাদীস-৬০৫৮)

হাদীসের মূলকথা

আলোচ্য হাদীসটি হলো হাদীসে কুদসী। যে হাদীসে আল্লাহ বলেছেন বা অনুরূপ কথা রয়েছে কিংবা যে হাদীসের কথা আল্লাহ তাআলার দিকে সম্পর্কিত সে হাদীসকে হাদীসে কুদসী বলা হয়। এ হাদীসে আল্লাহর ওলীদের সাথে শত্রুতার পরিণাম ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পদ্ধতির পাশাপাশি ওলীদের মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ওলীর পরিচয়

ওলী শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো, বন্ধু, অভিভাবক, ঘনিষ্ট বা নিকটজন ইত্যাদি। ওলীআল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি ঈমান ও তাকওয়ার গুণে বিভূষিত হয়ে আল্লাহর কুরবত বা নৈকট্য লাভ করে থাকেন।

পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ– الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ.

-জেনে রাখো, আল্লাহর ওলীদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারা সেসকল লোক, যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে। (সূরা ইউনুস, আয়াত ৬২-৬৩)

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবন কাসীর (র.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা (এ আয়াতে) সংবাদ প্রদান করেন যে, যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে তারাই তাঁর ওলী। সুতরাং প্রত্যেক তাকওয়াবান ব্যক্তিই আল্লাহর ওলী। (তাফসীরে ইবন কাসির, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৭৮)

হযরত ইবন আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)সহ একাধিক সালফে সালিহীন থেকে বর্ণিত আছে যে, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় তারাই আল্লাহর ওলী। (প্রাগুক্ত)

আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (র.) বলেন, যিনি আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, সর্বদা তাঁর আনুগত্য করেন এবং তাঁর ইবাদতে একনিষ্ঠ থাকেন তিনিই আল্লাহর ওলী। (ফাতহুল বারী, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৩৪২)

ব্যাপকার্থে যিনি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান রেখে তাঁর আনুগত্য ও ইবাদতে জীবন পরিচালনা করেন, তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকেন, হালাল গ্রহণ করেন, হারাম বর্জন করেন এবং প্রবৃত্তির মন্দ চাহিদা থেকে বিমুখ থেকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন তিনিই আল্লাহর ওলী।

আল্লাহর ওলীদের সাথে শত্রুতার পরিণাম

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ -যে আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম।

এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর ওলীদের সাথে যারা শত্রুতা পোষণ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। এটি অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী। আল্লাহর ওলীগণ ঈমান ও তাকওয়ার গুণে বিভূষিত হয়ে ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন। তারা স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা

উপেক্ষা করে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করেন না। ফলে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হন। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য এমন মানুষদের সাথে যখন কেউ শত্রুতা পোষণ করে এবং তাদের কষ্ট দেয় তখন আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। ফলে স্বয়ং আল্লাহ তার প্রতিপক্ষ হয়ে যান। আর আল্লাহ যার প্রতিপক্ষ হয়ে যান এবং যার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেন সে ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আল্লাহ যে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন বরং এর অর্থ হলো তিনি তাকে সমুচিত শাস্তি দিবেন। তিনি কীভাবে শাস্তি দিবেন সেটা তাঁর ইচ্ছাধীন। আল্লাহর ওলীদের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এরকম বহু বর্ণনা ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় আল্লাহ এমন সূক্ষ্ম শাস্তি প্রদান করেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শাস্তির বিষয় অনুধাবনও করতে পারে না। সুতরাং আল্লাহর ওলীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যেন আল্লাহর কোনো ওলীর সাথে আমাদের দ্বারা কোনো মন্দ আচরণ না হয়। তাদের কারো প্রতি যেন আমরা কোনো বিদ্বেষ পোষণ না করি।

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মূল মাধ্যম

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ –আমি বান্দার উপর যা ফরয করেছি আমার নিকট তা থেকে অধিক প্রিয় এমন কোনো বিষয় নেই যা দ্বারা বান্দা আমার অধিক নৈকট্য অর্জন করতে পারে।

এখানে আল্লাহ ফরয প্রতিপালনকে তাঁর নৈকট্য অর্জনে সবচেয়ে প্রিয় মাধ্যম হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর অনেক আমল ও বহু বিষয় ফরয হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা, শিরক না করা, পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করা, রামাদান মাসের রোযা রাখা, সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি। সব ধরনের হারাম থেকে বেঁচে থাকাও ফরয। তাই করণীয় ফরয প্রতিপালনের পাশাপাশি সব ধরনের হারাম থেকেও বেঁচে থাকা আবশ্যক। বিশেষত হারাম জীবিকা থেকে বেঁচে না থাকলে অনেক ফরয ও নফল ইবাদত বিনষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহর দরবারে দুআও কবূল হয় না।

প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্য ফরয প্রতিপালন করা অবশ্য কর্তব্য। যখন মুমিন ব্যক্তি ফরয বিষয়গুলো প্রতিপালন করে তখন সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। এমনকি কোনো মুমিন ব্যক্তি যদি কেবল ফরয প্রতিপালন করে; কোনো নফল আমল করতে সক্ষম নাও হয়, তবুও সে আল্লাহর কুরবত ও পরকালীন সফলতা লাভ করবে।

নফলের মাধ্যমেও আল্লাহর কুরবত হাসিল হয়

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، -আর আমার বান্দা নফলের মাধ্যমেও আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি তাকে ভালোবেসে নেই।

এখানে নফলকেও আল্লাহ তাআলা তাঁর কুরবত বা নৈকট্য হাসিল ও ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ফরয প্রতিপালনের পাশাপাশি নফল ইবাদতের মাধ্যমেও বান্দা আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা লাভ করে থাকে। তাই আমাদের নফল ইবাদতের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।

এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ফরয আমল পরিত্যাগ করা কবীরা গুনাহ। আর নফল আমল করলে সাওয়াব, না করলে গুনাহ নেই। তাই ফরয ও নফলকে এক করে দেখা কিংবা ফরযের উপর নফলকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রথমত ফরয আমলের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এরপর সাধ্যমতো নফল আমলে মনোনিবেশ করতে হবে।

ওলীদের মর্যাদা

যখন আল্লাহ তার কোনো বান্দাকে ভালোবেসে নেন তখন সে মর্যাদার কোন স্তরে উন্নীত হয় সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ

-যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে, আমি তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকট কোনো কিছু চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। যদি সে আমার নিকট আশ্রয় চায় তাহলে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দান করি।

এখানে আল্লাহ তাঁর বান্দার কান, চোখ, হাত ও পা হয়ে যান মর্মে যে বর্ণনা এসেছে তা মূলত প্রকৃত অর্থে নয়; বরং উদাহরণ হিসাবে এসেছে। এর সারকথা হলো, আল্লাহ তাঁর বান্দার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে স্বীয় নির্দেশের অনুগামী করে দেন। ফলে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে কোনো কিছু করার চিন্তা করতে পারে না। সে আপন কান দিয়ে কেবল আল্লাহর কথাই শুনে, চোখ দিয়ে কেবল আল্লাহর নির্দেশিত জিনিস দেখে, হাত দিয়ে আল্লাহর নির্দেশিত জিনিস ধরে, পা দিয়ে কেবল আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে।

এ হাদীসাংশের সারকথা হলো, আল্লাহর প্রিয় বান্দা যখন স্বীয় মনিবের ইবাদত-বন্দেগী করতে করতে তাঁর ভালোবাসায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে তখন এর বিনিময়ে সে আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করে এবং এমন এক অবস্থায় পৌঁছে যে, তার চলাফেরা, উঠাবসা, আচার-ব্যবহার এককথায় তার জীবনের সকল কর্ম আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অধীন হয়ে যায়। তখন তার কান, চোখ, হাত, পাসহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিজস্ব কোনো চাহিদা থাকে না। আল্লাহর ইচ্ছা, চাহিদা ও নিয়ন্ত্রণে এগুলো পরিচালিত হয়।

বান্দা যখন এমন স্তরে উন্নীত হয় তখন সে 'মুস্তাজাবুদ দাওয়াত' হয়ে যায় অর্থাৎ তাঁর দুআ আল্লাহর দরবারে মকবূল হয়। ফলে সে আল্লাহর কাছে যা চায় আল্লাহ তাকে তা দান করেন এবং কোনো কিছু থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইলে আল্লাহ তাকে তা থেকে আশ্রয় দেন।

শেষ কথা

ওলায়ত তথা আল্লাহর ওলী হওয়া বান্দাদের জন্য একটি বিশেষ স্তর। ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে এ স্তর অর্জিত হয়। তাকওয়ার গুণে বিভূষিত প্রত্যেক মুমিনই আল্লাহর ওলী। এটি ওলায়াতের সাধারণ স্তর। এর পাশাপাশি যথাযথভাবে ফরয প্রতিপালন ও বেশি করে নফল ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে একজন মুমিন ওলায়াতের শীর্ষস্তরে আরোহন করে। আল্লাহ তাঁর ওলীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাদের সাথে যারা শত্রুতা পোষণ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর ওলীদের বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। তাদের কারো সমালোচনা, সম্মানহানি কিংবা কথা ও কাজে তাদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। কখনো কখনো কেউ কেউ নিজ সিলসিলার ওলী-বুযুর্গের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে গিয়ে অন্য সিলসিলার ওলী-বুযুর্গের সম্মানহানি করে ফেলেন। এ থেকেও বিরত থাকা উচিত।

প্রবন্ধ

শবে মীলাদের মু'জিযা

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)

বাইহাকী ও আবূ নুআইমের রিওয়ায়াতে আছে, হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা.) বর্ণনা করেন, আমি সাত-আট বছরের সচেতন বালক ছিলাম। একদিন এক ইয়াহুদী একটি টিলায় আরোহণ করে মদীনার ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে ডাকল। তারা সমবেত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি? ইয়াহুদী বলল, আজ রাতে আহমদ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর নক্ষত্র উদিত হয়ে গেছে।

বাইহাকী, তাবারানী, আবূ নুআইম ও ইবন আসাকির হযরত উসমান ইবন আবুল আস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন, আমার মা আমাকে বলেছেন যে, যখন আমিনার গৃহে রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ঘরের চার কোণ নূরের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল। তারকারাজি এমনভাবে ঝুঁকে পড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন আমার উপরই আছড়ে পড়বে। তার জন্মের সময় আমিনার শরীর থেকে একটি নূর উদিত হয়ে সমগ্র গৃহকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলে।

আহমদ, বাযযায, তাবারানী, হাকিম, বাইহাকী ও আবূ নুআইম ইরবায ইবন সারিয়া (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহর বান্দা। আমি তখন থেকে খাতামুন্নাবিয়্যীন, যখন আদমের সত্তা মাটি ও পানির মধ্যে ছিল। আমি হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দুআ, হযরত ঈসা (আ.) এর সুসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন, যা তিনি দেখেছেন। পয়গাম্বরগণের জননীগণ এরূপ স্বপ্ন দেখে থাকেন। নবী করীম ﷺ এর জননী তাঁর জন্মের সময় একটি নূর দেখেন, যা দ্বারা সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ চমকে উঠে।

হাকিম ও বাইহাকী খালিদ ইবন মা'দান থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন, তিনি বললেন, আমি হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দুআ এবং হযরত ঈসা (আ.) এর সুসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন, যা তিনি দেখেছেন। আমার মা আমি গর্ভে থাকা অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছেন যেন তার শরীর থেকে একটি নূর উদিত হয়েছে, যার ফলে শাম দেশের বুসরা ভূখণ্ড আলোকময় হয়ে গেছে। খালিদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জননী গর্ভাবস্থায় যে নূর দেখেছিলেন, সেটা ছিল স্বপ্ন; কিন্তু জন্মের সময় যে নূর দেখেছিলেন, সেটা ছিল জাগ্রত অবস্থায় বাস্তব ঘটনা। ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াতে হযরত আমিনা বর্ণনা করেন যে, গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর কেউ তাঁকে বলল, তোমার গর্ভে এই উম্মতের সরদার রয়েছেন। এর নিদর্শন এই যে, যখন তিনি ভূমিষ্ঠ হবেন, তখন একটি নূর উদিত হবে, যার ফলে শাম দেশের বসরার রাজপ্রাসাদ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এই শিশু জন্মগ্রহণ করলে তার নাম রাখবে মুহাম্মদ।

ইবন সা'দ ও ইবন আসাকির হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, হযরত আমিনা বলেছেন, নবী করীম ﷺকে গর্ভে ধারণ করার পর তার জন্ম পর্যন্ত আমার কোনো কষ্ট হয়নি। তিনি যখন ভূমিষ্ট হলেন, তখন তাঁর সাথে একটি নূর উদিত হলো, যার ফলে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী সমস্ত ভূপৃষ্ঠ আলোকময় হয়ে গেল। জন্মের সময় তিনি হাত দিয়ে মাটিতে ভর দেন। এক মুষ্টি মাটি নিয়ে হাত বন্ধ করে নেন এবং আকাশ পানে তাকিয়ে থাকেন।

ইবন সা'দ সওর ইবন ইয়াযীদ থেকে, তিনি আবুল আজফা থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি যখন ভূমিষ্ঠ হলাম, তখন আমার জননী আপন শরীর থেকে একটি নূর উদিত হতে দেখলেন, যার ফলে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ে।

আবূ নুআইম আতা ইবন ইয়াসার থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, হযরত উম্মু সালামাহ (রা.) হযরত আমিনার এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যে রাতে নবী করীম ﷺ জন্মগ্রহণ করেন, আমি একটি নূর উদিত হতে দেখি, যে কারণে সিরিয়ার প্রাসাদ এতটুকু উজ্জ্বল হয়ে যায় যে, আমি তা দেখতে পাই।

ইবন সা'দ আমর ইবন আসিম থেকে, তিনি হুমাম ইবন ইয়াহইয়া থেকে, তিনি ইসহাক ইবন আবদুল্লাহ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জননীর এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগ্রহণ করলে আমার শরীর থেকে একটি নূর উদিত হয়, যার ফলে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ আলোকময় হয়ে যায়। তিনি সম্পূর্ণ পাক পবিত্র অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হয়েই তিনি মাটিতে হাত রাখেন।

ইবন সা'দ মুআয আম্বরী থেকে, তিনি ইবন আওন থেকে, তিনি ইবনুল কিবতিয়া থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, হযরত আমিনা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্ম প্রসঙ্গে বলেছেন, আমি আমার শরীর থেকে একটি আলোকপিণ্ড উদিত হতে দেখি, যার ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

ইবন সা'দ হাসসান ইবন আতিয়্যা থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলে করীম ﷺ ভূমিষ্ঠ হয়ে হাতের তালু ও হাঁটু দিয়ে মাটিতে ভর দেন। তাঁর দৃষ্টি আকাশ পানে নিবদ্ধ ছিল।

ইবন সা'দ মূসা ইবন উবায়দা থেকে, তিনি আপন ভাই থেকে রিওয়ায়াত করেন, নবী করীম ﷺ ভূমিষ্ঠ হয়ে হাত দিয়ে মাটিতে ভর দেন। মাথা আকাশ পানে উত্তোলন করেন এবং হাতে এক মুষ্টি মাটি তুলে নেন। বনূ-লাহাবের এক ব্যক্তি এই খবর পেয়ে মন্তব্য করলো, একথা সত্য হলে এই শিশু সমগ্র বিশ্ব করতলগত করে নিবে।

আবূ নুআইম আবদুর রহমান ইবন আউফ থেকে, তিনি তার জননী আশ শিফা বিনতে আমর ইবন আউফের এ মর্মের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম ﷺ এর জন্ম আমার হাতে হয়েছে। তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ছিল। আমি কাউকে বলতে শুনলাম, তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত, তোমার প্রতি তোমার রবের রহমত। এরপর আমার সামনে পূর্ব ও পশ্চিম আলোকিত হয়ে গেল এবং আমি রোমের কিছু রাজপ্রাসাদ দেখতে পেলাম। এরপর আমি নবজাত শিশুকে কাপড় পরিয়ে শুইয়ে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার উপর তমসা ও ভীতির একটা পর্দা যেন পড়ে গেল

এবং শরীরে কম্পন এসে গেল। আমি কাউকে বলতে শুনলাম, তুমি একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? জবাব দেওয়া হলো- পশ্চিম দিকে। এরপর আমার এ অবস্থা কেটে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পুনরায় সে অবস্থা আমাকে আচ্ছন্ন করে নিল ভীতি, অন্ধকার ও কম্পন। আবার কাউকে বলতে শুনলাম, একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? জওয়াব এলো- পূর্ব দিকে। শিফা বিনতে আমর ইবন আউফ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নবুওয়াতপ্রাপ্তি পর্যন্ত এই কথাগুলো আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। তিনি যখন নবুওয়াতপ্রাপ্ত হলেন, তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।

আবূ নুআইম আমর ইবন কুতাইবা থেকে, তিনি আপন পিতার কাছ থেকে শুনেছেন যে, হযরত আমিনার সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাগণকে আদেশ করলেন, সমস্ত আকাশ ও জান্নাতের দরজা খুলে দাও। সকল ফিরিশতা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হোক। সে মতে ফিরিশতারা একে অপরকে সুসংবাদ দিতে দিতে হাযির হতে লাগল। পৃথিবীর পাহাড়সমূহ উঁচু হয়ে গেল এবং সমুদ্র স্ফীত হয়ে গেল। এসবের অধিবাসীরা একে অপরকে সুসংবাদ দিল। সকলে হাযির হয়ে গেল। শয়তানকে সত্তরটি শিকল পরানো হল এবং তাকে কাস্পিয়ান সাগরে উপুড় করে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। সকল দুষ্ট ও অবাধ্য মাখলুককেও শৃঙ্খলবদ্ধ করে দেওয়া হলো। সূর্যকে সেদিন অসাধারণ আলো প্রদান করা হলো এবং তার প্রান্তে শূন্য পরিমণ্ডলে সত্তর হাজার হুরকে দাঁড় করানো হলো যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মের অপেক্ষায় ছিল। নবী করীম ﷺ এর সম্মানার্থে আল্লাহ তাআলা সে বছর পৃথিবীর সকল নারীর জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করে দিলেন। এটাও ঠিক করলেন যে, কোনো বৃক্ষ ফলবিহীন থাকবে না এবং যেখানে অশান্তি সেখানে শান্তি স্থাপিত হয়ে যাবে। অতঃপর যখন প্রতীক্ষিত জন্ম হলো, তখন সমস্ত পৃথিবী নূরে ভরে গেল। ফিরিশতারা একে অপরকে মুবারকবাদ দিল। প্রত্যেক আকাশে পদ্মরাগ মণি ও চুনির স্তম্ভ নির্মিত হলো। ফলে আকাশ আলোকোজ্জ্বল হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ শবে মিরাজে এসব স্তম্ভ দেখতে পেলে তাঁকে বলা হয় যে, এগুলো আপনার জন্মের সুসংবাদের কারণে নির্মিত হয়েছিল। যে রাতে রাসূলে করীম ﷺ এর জন্ম হয়, আল্লাহ তাআলা হাওযে কাওসারের কিনারে সত্তর হাজার মিশক আম্বরের বৃক্ষ সৃষ্টি করেন এবং এসবের ফলকে জান্নাতীদের সুগন্ধি সাব্যস্ত করেন। সে রাতে সকল আকাশের অধিবাসীরা নিরাপত্তার জন্য দুআ করেন। সকল প্রতিমা উপুড় হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। লাত ও উয্যা আপন আপন ধনভাণ্ডার উদগীরণ করে দেয়। তারা বলাবলি করতে থাকে কুরাইশদের মধ্যে আল-আমীন এসেছেন, সিদ্দীক এসেছেন; অথচ কুরাইশরা জানেই না যে, কি হয়ে গেল। বাইতুল্লাহ থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত এই আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে– এখন পূর্ণচন্দ্র ফিরে এসেছে। এখন আমার যিয়ারতকারীরা আগমন করবে, এখন আমি মূর্খতার আবর্জনা থেকে পাক পবিত্র হয়ে যাব। হে উয্যা! তোর ধ্বংস এসে গেছে। বাইতুল্লাহর ভূকম্পন তিনদিন ও তিন রাতে খতম হলো। এটা ছিল পবিত্র জন্মের প্রথম নিদর্শন, যা কুরাইশরা অবলোকন করলো।

আবূ নুআইম রিওয়ায়াত করেন যে, হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, গর্ভধারণের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, সে রাতে কুরাইশদের প্রত্যেকটি জন্তু বলল, কা'বার প্রতিপালকের কসম, গর্ভ হয়ে গেছে। তিনিই দুনিয়ার শান্তি এবং দুনিয়াবাসীদের প্রদীপ। সে রাতে কুরাইশদের এবং আরবের সকল গোত্রের অতিন্দ্রীয়বাদী নারীদের সঙ্গিনী জিন আত্মগোপন করে এবং তাদের অতিন্দ্রীয়বাদ বিদ্যা খতম হয়ে যায়। দুনিয়ার সকল বাদশাহের সিংহাসন ভেঙ্গে যায়। সেদিন বাদশাহরা সকলেই বোবা হয়ে যায়। পূর্বের জন্তু-জানোয়াররা পশ্চিমের জন্তু জানোয়ারদের কাছে সুসংবাদ নিয়ে যায়। এভাবে সমুদ্রের প্রাণীরা একে অপরকে সুসংবাদ দেয়। গর্ভের প্রত্যেক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আকাশে এবং পৃথিবীতে ঘোষণা করা হতো- সুসংবাদ! এখন আবুল কাসিম ﷺ কল্যাণ ও বরকত নিয়ে দুনিয়াতে এসে গেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জননীর উদরে পূর্ণ নয় মাস অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁর জননী পেটে কোনো ব্যথা বা অস্থিরতা অনুভব করেননি। এমন কোনো বিষয়ও হয়নি, যা সাধারণত গর্ভাবস্থায় হয়ে থাকে। মাতৃগর্ভে থাকাকালেই পিতা আবদুল্লাহর ইন্তিকাল হয়ে যায়। এতে ফিরিশতারা বললেন, পরওয়ারদিগার! আপনার এই নবী ইয়াতীম হয়ে গেছেন। পরওয়ারদিগার ইরশাদ করলেন, আমি তার অভিভাবক, রক্ষক ও মদদগার। তোমরা তাঁর জন্ম থেকে বরকত হাসিল কর। তাঁর জন্ম বরকতময়। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্মের সময় আকাশ ও জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। হযরত আমিনা নিজের সম্পর্কে বলেন, গর্ভের ছয়মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমার কাছে জনৈক আগন্তুক এসে নিদ্রায় আমার পায়ে টোকা দিয়ে বলল, হে আমিনা! তুমি সারাবিশ্বের মনোনীত ব্যক্তিকে গর্ভে ধারণ করেছ। সে জন্মগ্রহণ করলে তার নাম রাখবে মুহাম্মদ। আমিনা নিজের নিফাস সম্পর্কে বলেন, আমারও তাই হয়েছে যা মহিলাদের হয়। কিন্তু কেউ জানতে পারেনি। এরপর আমি ভীষণ গড়গড় শব্দ শুনতে পাই এবং ভীত হয়ে পড়ি। দেখি কি যেন কোন সাদা পাখির পাখা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। ফলে সমস্ত ভয় ও কষ্ট দূর হয়ে গেল। এরপর দেখি, সাদা দুধে পূর্ণ একটি পেয়ালা রাখা আছে। আমি পিপাসার্ত ছিলাম। তাই পাত্র তুলে পান করে নিলাম। এরপর আমার শরীর থেকে একটি নূর উদিত হলো। তখন কয়েকজন মহিলা দৃষ্টিগোচর হলো। তাঁরা খেজুর গাছের মতো দীর্ঘ ছিলেন। মনে হচ্ছিল তাঁরা আবদে মানাফ পরিবারের কন্যা। তাঁরা আমাকে গভীরভাবে দেখতে লাগলেন। আমি হতভম্বই ছিলাম, এমন সময় একটি কিংখাব (ফুলকাটা জরিদার রেশমী বস্ত্র) আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে ছড়িয়ে পড়ল। কেউ বলল, তাকে মানুষের দৃষ্টি থেকে উধাও করে নাও। এরপর কিছু লোক দেখলাম, তারা শূন্য মণ্ডলে রূপার লোটা হাতে দণ্ডায়মান ছিল। এরপর পাখিদের একটি ঝাঁক এলো এবং আমার কোল আবৃত করে নিলো। তাদের চঞ্চু পান্নার এবং পাখা চুনির ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমার সামনে পূর্ব ও পশ্চিম উন্মুক্ত করে দিলেন। আমি তিনটি ঝাণ্ডা উড্ডীয়মান দেখলাম। একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে ও একটি কা'বা গৃহের ছাদে। এরপর আমার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হলো এবং নবী করীম ﷺ জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি যখন বাইরে এলেন, তখন আমি তাঁকে সিজদারত দেখলাম। তিনি অনুনয় সহকারে আঙ্গুলি উত্তোলিত রেখেছিলেন। এরপর আকাশে একটি সাদা মেঘ এসে আকাশকে আচ্ছন্ন করে নিল। অতঃপর অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি একজনকে বলতে শুনলাম মুহাম্মদকে পূর্ব ও পশ্চিমে নিয়ে যাও এবং সমুদ্রে নিয়ে যাও। যাতে মানুষ তাঁর নাম, আকৃতি ও গুণাবলি সম্পর্কে ওয়াকিফ হয়ে যায় এবং তারা জানতে পারে যে, তাঁর নাম "মাহী"। তাঁর আমলে শিরক মেটে যাবে। এর পরক্ষণেই আমি তাকে একটি সাদা পশমী কাপড়ে জড়িত দেখলাম। নীচে ছিল সবুজ রেশম। তিনি যেন বহু মূল্যবান ধাতু নির্মিত তিনটি

চাবি হাতের মুঠিতে ধারণ করে রেখেছেন। আওয়াজ এলো, মুহাম্মদ নবুওয়াতের চাবি গ্রহণ করেছেন। এরপর একটি মেঘখণ্ড এলো, যার মধ্য থেকে অশ্বের হ্রেষার এবং পাখা নাড়ানোর শব্দ ভেসে আসছিল। অবশেষে সেটি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অতঃপর অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর কেউ ডেকে বলল, মুহাম্মদকে পূর্ব ও পশ্চিমে নিয়ে যাও, পয়গাম্বরগণের জন্মভূমিতে নিয়ে যাও। জিন, মানব, পশুপক্ষী এবং হিংস্র প্রাণীদের কাছে নিয়ে যাও। তাঁকে আদম (আ.) এর পরিচ্ছন্নতা, নূহ (আ.) এর নম্রতা, ইবরাহীম (আ.) এর বন্ধুত্ব, ইসমাঈল (আ.) এর ভাষা, ইয়াকুব (আ.) এর মুখমণ্ডল, ইউসুফ (আ.) এর রূপ, দাউদ (আ.) এর কণ্ঠস্বর, আইয়ুব (আ.) এর সবর, ইয়াইয়া (আ.) এর বৈরাগ্য এবং ঈসা (আ.) এর কৃপা দান করো। তাকে সকল পয়গাম্বরের চরিত্রের নমুনা করে দাও। এরপর এই অবস্থাও দূর হয়ে গেল। এরপর আমি আমার শিশুর হাতে সবুজ রেশমী বস্ত্র জড়িত দেখলাম। কেউ বলল মুহাম্মদ সারা বিশ্ব দখল করে নিয়েছে। সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু তার মুঠিতে চলে গেছে। এরপর তিন ব্যক্তি এলো। তাদের একজনের হাতে রূপার লোটা, অপর জনের হাতে সবুজ পান্নার ক্ষুদ্র প্লেট এবং তৃতীয় জনের হাতে সাদা রেশম রয়েছে। সেটি খুলে সে একটি মনোমুগ্ধকর আংটি বের করল। লোটার পানি দিয়ে আংটিটি সাতবার ধৌত করে সেটি দিয়ে নবী করীম ﷺ এর দুই কাঁধের মধ্যস্থলে মোহর করে দিল। অতঃপর কিছুক্ষণ আপন পাখায় আবৃত রেখে আমাকে ফিরিয়ে দিল।

আবূ নুআইম দুর্বল সনদে রিওয়ায়াত করেন যে, হযরত আব্বাস (রা.) বলেছেন, আমাদের ছোটভাই আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করলে তাঁর মুখমণ্ডলে নূর সূর্যের মতো ঝলমল করতো। আমাদের পিতা বললেন, এই শিশুর অদ্ভুত অবস্থা। আমি স্বপ্নে দেখলাম তার নাসিকা থেকে একটি সাদা পাখি বের হয়ে উড়ে গেল এবং পূর্ব ও পশ্চিম ঘুরে কাবাগৃহের উপর পতিত হলো। সমগ্র কুরাইশ গোষ্ঠি তাকে সিজদা করল। অতঃপর পাখিটি আবার আকাশে উড়ে গেল। আমি বনূ-মাখযূমের অতিন্দ্রীয়বাদিনীর কাছে গেলে সে বলল, তোমার এ স্বপ্ন সত্য হলে তোমার ঔরস থেকে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। পূর্ব ও পশ্চিমের অধিবাসীরা তাঁর অনুসারী হয়ে যাবে।

অতঃপর আমিনা সন্তান প্রসব করলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি দেখেছ? সে বলল, আমার প্রসব ব্যথা শুরু হলে আমি গড়গড় আওয়াজ এবং কিছু মানুষের কথা বলার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর আমি ইয়াকূতের খুঁটিতে কিংখাবের ঝাণ্ডা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে স্থাপিত দেখলাম। আমি শিশুর মাথা থেকে একটি নূর উদিত হতে দেখলাম, যা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এর আলোকে আমি সিরিয়ার প্রাসাদকে স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলতে দেখলাম। এরপর আমি নিকটেই পাখির একটি ঝাঁক নবী করীম ﷺকে পাখা বিস্তার করে সিজদা করতে দেখলাম। আমি সায়ীরা আসাদীর জিনকে বলতে শুনলাম, তোমার এই পুত্রের জন্মের কারণে প্রতিমা ও অতিন্দ্রীয়বাদীদের ধ্বংস হয়ে গেছে। সায়ীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। এরপর আমি একজন দীর্ঘদেহী সুশ্রী যুবককে দেখলাম। সে নবী করীম ﷺকে আমার কোল থেকে নিয়ে গেল এবং তার মুখে থুথু দিল। তার কাছে স্বর্ণের একটি প্লেট ছিল। সে নবী করীম ﷺ এর বুক চিরে হৃদপিণ্ড বের করল। অতঃপর হৃদপিণ্ডটি চিরে একটি কালো বিন্দু বের করে দূরে নিক্ষেপ করল। প্লেটে সাদা রঙের সুগন্ধি ছিল। তা হৃদপিণ্ডে ভরে দেওয়া হলো। এরপর একটি সাদা রেশমী থলে থেকে একটি আংটি বের করল এবং তার সাহায্যে নবী করীম ﷺ এর দুই কাঁধের মধ্যভাগে মোহর এঁটে দিল। অতঃপর তাকে জামা পরিয়ে দিল।

হাফিয আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন মায়িয মীলাদ প্রসঙ্গে হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, হযরত আমিনা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্ম দিবসের আশ্চর্য ঘটনাবলি বর্ণনায় বলেন, আমি সেদিনের ঘটনাবলিতে বিস্ময়াবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় তিন ব্যক্তি আগমন করল। তাদের সৌন্দর্য দেখে মনে হচ্ছিল সূর্য যেন তাদের মুখমণ্ডল থেকে উদিত হচ্ছে। একজনের হাতে রূপার লোটা ছিল, যা থেকে মেশকের খুশবু ভেসে আসছিল। দ্বিতীয় জনের হাতে পান্নার চতুষ্কোণ প্লেট ছিল। প্রত্যেক কোণে একটি সাদা মোতি জড়ানো ছিল। কেউ বলল, এটা সারা বিশ্ব-পূর্ব পশ্চিম, জল ও স্থল। হে আল্লাহর হাবীব! এটি ধারণ করুন যেদিক দিয়ে ইচ্ছা, একথা শুনে আমিও ঘুরে গেলাম এটা দেখার জন্যে যে, তিনি কোনদিকে ধরেন। তিনি মাঝখানে ধরলেন। আওয়াজ এলো কা'বার কসম, মুহাম্মদ কা'বা ধারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্যে কা'বাকে কিবলাহ ও বাসস্থান করে দিয়েছেন। আমি দেখলাম তৃতীয় জনের হাতে খুব উত্তমরূপে ভাঁজ করা একটি সাদা রেশমী বস্ত্র রয়েছে। সে কাপড়টি খুলল এবং তার ভিতর থেকে একটি সুশ্রী আংটি বের করল। এরপর আমার দিকে অগ্রসর হলো। প্লেটওয়ালা ব্যক্তি আংটিটি নিয়ে সাতবার লোটার পানি দ্বারা ধৌত করল। এরপর সেটি দিয়ে নবী করীম ﷺ এর দুই কাঁধের মাঝখানে মোহর এঁকে দিল। অতঃপর সেটি রেশমে ভাজ করে তাতে মেশকের সূতা বেঁধে দিল। অতঃপর সেটি কিছুক্ষণ আপন পাখায় রেখে দিল। (ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, এই ব্যক্তি ছিল জান্নাতের রক্ষী রিদওয়ান।) সে নবী করীম ﷺ এর কানে কিছু কথা বলল, যা আমি বুঝতে পারিনি। অতঃপর সে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনাকে সুসংবাদ। প্রত্যেক নবীর জ্ঞান আমি আপনাকে দিয়েছিলাম। আপনি তাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানবান এবং সর্বাধিক বীরপুরুষ। আপনার কাছে সাফল্যের চাবি রয়েছে। আপনাকে প্রখর ব্যক্তিত্ব ও জাকজমক দান করা হয়েছে। হে আল্লাহর খলীফা! যে কেউ আপনার নাম শুনবে, আপনাকে না দেখেই তার অন্তর কেঁপে উঠবে। ইবন ওয়াহিদ 'তানভীর' গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি অজ্ঞাত।

ইবন সা'দ, হাকিম, বাইহাকী ও আবূ নুআইম হযরত আয়িশা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন, তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহুদী মক্কায় বাস করত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করত। মীলাদের রাত্রিতে সে কুরাইশদের মজলিসে এসে বলল, হে কুরাইশগণ! আজ রাতে তোমাদের মধ্যে কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করেছে কি? তারা বলল, আমাদের জানা নেই। সে বলল, মনে রেখ, এ রাতে আখিরী উম্মতের নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। তার কাঁধের মাঝখানে চিহ্ন আছে, যাতে কিছু চুল রয়েছে। এই শিশু দুদিন দুধ পান করবে না। কেননা, কোনো জিন তার মুখে অঙ্গুলি রেখেছে। কুরাইশরা বিস্ময় সহকারে মজলিস ত্যাগ করল। আপন আপন গৃহে পৌঁছে তারা গৃহের লোকজনকেও একথা বলল। তারা বলল, আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র সন্তান হয়েছে। তারা তার নাম রেখেছে মুহাম্মদ। অতঃপর কুরাইশরা ইয়াহুদীর কাছে পৌঁছে এ সংবাদ জানিয়ে দিল। সে বলল, আমাকে নিয়ে চল। আমি এই শিশুকে দেখতে চাই। সে মতে তারা ইয়াহুদীকে হযরত আমিনার কাছে নিয়ে গেল এবং শিশুকে দেখাতে বলল। হযরত আমিনা দেখালেন। তারা তাঁর পিঠ খুলে সেখানে একটি তিলের ন্যায় চিহ্ন দেখতে পেল। এটা দেখে ইয়াহুদী সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে এলে কুরাইশরা জিজ্ঞাসা করল? তোমার কি হয়েছিল? সে বলল, বনী ইসরাঈল থেকে নবুওয়াত খতম হয়ে গেছে। তোমাদের এতে আনন্দিত হওয়া উচিত। আল্লাহর কসম! সে তোমাদের উপর এমন বিজয় অর্জন করবে যে,

তার খবর পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

বাইহাকী ও ইবন আসাকির আবুল হাকাম তানূখী থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, কুরাইশদের মধ্যে কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তাকে হাঁড়ি দেওয়ার জন্যে মহিলাদের হাতে সোপর্দ করা হতো। তারা শিশুকে সকাল পর্যন্ত হাঁড়ির নিচে রাখত। সে মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভূমিষ্ঠ হলে আবদুল মুত্তালিব তাঁকে মহিলাদের কাছে সোপর্দ করলেন। সকালে এসে তারা দেখল যে, হাঁড়ি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় চক্ষু মেলে আকাশ পানে তাকিয়ে আছেন। মহিলারা আবদুল মুত্তালিবের কাছে এসে বলল, আমরা এমন শিশু কখনও দেখিনি। তার উপরে হাঁড়ি ভেঙ্গে গেছে এবং আমরা তাঁকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। আবদুল মুত্তালিব বললেন, তাকে হিফাযত কর। আমি মঙ্গলই আশা করি। সপ্তম দিনে আবদুল মুত্তালিব জন্তু যবেহ করলেন এবং কুরাইশদেরকে দাওয়াত করলেন। আহার শেষে সকলেই জিজ্ঞাসা করল, আবদুল মুত্তালিব! শিশুর কি নাম রেখেছেন? তিনি বললেন, নাম রেখেছি মুহাম্মদ। তারা বলল, এমন নাম রাখার কারণ কি? আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমি চাই যে, আকাশে আল্লাহ তাআলা এবং পৃথিবীতে মানবজাতি তার প্রশংসা করুক।

আবূ নুআইম ও ইবন আসাকির মুসাইয়িব ইবন শরীফ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবন শরীফ থেকে, তিনি আমর ইবন শরীফ থেকে, তিনি আপন পিতা থেকে, তিনি আপন দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, মাররুয-যাহরানে ঈসা নামক এক সিরীয় সন্ন্যাসী বাস করত। সে ছিল বিজ্ঞ আলিম। অধিকাংশ সময় গির্জার ভিতরেই অবস্থান করতো। মাঝে মাঝে মক্কায় এলে মানুষ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যেত। তখন সে বলত তোমাদের মধ্যে এক শিশু জন্মগ্রহণ করবে। তার সামনে সমগ্র আরব মাথা নত করবে এবং সে অনারবেরও মালিক হয়ে যাবে। এটাই তার আগমনের সময়। যে তাঁর সময় পাবে এবং তাঁর অনুসরণ করবে, সে সফলকাম হবে। আর যে তার বিরোধিতা করবে, সে ব্যর্থ মনোরথ হবে। আল্লাহর কসম! আমি রুটি ও শরাবের দেশ এবং শান্তির জায়গা ছেড়ে এই অভাব-অনটন ও ভয়ভীতির স্থানে তাঁরই অন্বেষণে এসেছি। উক্ত সন্ন্যাসী মক্কার প্রতিটি নবজাত শিশু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত এবং বলত এখনও আসেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মের সকালে আবদুল মুত্তালিব 'ঈসা' সন্ন্যাসীর দ্বারে দাঁড়িয়ে তাকে ডাক দিলেন। সে প্রশ্ন করল, কে? উত্তর হলো- আমি, আবদুল মুত্তালিব। সন্ন্যাসী তাঁর কাছে এসে বলল, সম্ভবত তুমিই তার বাপ। আজ সেই শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, যার সম্পর্কে আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, সে সোমবারে জন্মগ্রহণ করবে, নবুওয়াত প্রাপ্ত হবে এবং সোমবারে ওফাত পাবে। তাঁর নক্ষত্র গত সন্ধ্যায় উদিত হয়ে গেছে। এর চিহ্ন এই যে, এখন তার ব্যথা আছে। এই ব্যথা তিনদিন থাকবে। তুমি মুখ বন্ধ রাখবে। কেননা, এতটুকু হিংসা কারও সাথে করা হয়নি, যা তার সাথে করা হবে এবং এতটুকু শত্রুতা কারও সাথে করা হয়নি, যা তার সাথে করা হবে। আবদুল মুত্তালিব জিজ্ঞাসা করলেন, সে কতটুকু বয়স পাবে? সন্ন্যাসী বলল, কম হোক কিংবা বেশি তবে সত্তর বছর হবে না; বরং এরকম কোনো বেজোড় সংখ্যায় হবে একষট্টি কিংবা তেষট্টি। তার উম্মতের লোকদেরও এরূপ বয়ঃক্রম।

আবূ নুআইম হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, জাহেলিয়াত যুগে রাতের বেলায় কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করলে তাকে হাঁড়ির নীচে রেখে দেওয়া হতো এবং সকাল পর্যন্ত কেউ তাকে দেখতো না। জন্মের পর নবী করীম ﷺকেও হাঁড়ির নীচে রেখে দেওয়া হয়। সকালে দেখা গেল, হাঁড়ি দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে এবং তার চক্ষু আকাশের দিকে উত্থিত। এতে সকলেই আশ্চর্যান্বিত হলো। এরপর তাঁকে দুধ পান করানোর জন্য বনূ বকরের এক মহিলার হাতে সোপর্দ করা হলো। সে তাকে দুধ পান করালে তার সংসারে চতুর্দিক থেকে কল্যাণ ও বরকত আসতে লাগল। তার কাছে গুটিকতক ছাগল ছিল। আল্লাহ তাতে বরকত দিলেন এবং ছাগলের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল।

আবূ নুআইম দাউদ ইবন আবী হিন্দ থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগ্রহণ করলে নবুওয়াতের নূরে টিলাসমূহ উজ্জ্বল হয়ে যায়, তিনি হাত দিয়ে মাটিতে ভর দেন এবং চক্ষুদ্বয় উন্মুক্ত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যখন তাঁকে বড় হাঁড়ি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় তখন হাঁড়ি দুটুকরা হয়ে যায়।

ইবন সা'দ হযরত ইকরিমা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগ্রহণ করলে তাঁর জননী তাঁর উপর হাঁড়ি রেখে দেন, যা ভেঙ্গে যায়। তিনি বলেন, আমি যখন তাঁকে দেখলাম, তখন তার চক্ষুদ্বয় উন্মুক্ত ছিল এবং তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

ইবন আবী হাতিম ইকরিমা থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, পবিত্র জন্মের সময় ভূপৃষ্ঠ নূরে উজ্জ্বল হয়ে যায়। ইবলীস বলল, আজ এমন এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে যে আমাদের কাজ কারবার পণ্ড করে দিবে। ইবলীসের এক সহচর বলল, তুমি যাও এবং তার জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট করে দাও। সে মতে ইবলীস এলো কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকটে পৌঁছলো, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাকে সজোরে লাথি মারলেন। ফলে সে আদনে গিয়ে পতিত হলো।

যুবাইর ইবন বাক্কার ও ইবন আসাকির মারুফ ইবন খানূস থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবলীস সপ্ত আকাশ প্রদক্ষিণ করত। কিন্তু যখন হযরত ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তিন আকাশেও প্রবেশাধিকার রহিত হয়ে গেল। এরপর যখন নবী করীম ﷺ জন্মগ্রহণ করলেন, তখনও তার জন্যে সাত আকাশের দরজাই বন্ধ করে দেওয়া হলো। নবী করীম ﷺ সোমবার দিন প্রত্যুষে জন্মগ্রহণ করেন।

বাইহাকী, আবূ নুআইম, খারায়েতী ও ইবন আসাকির আবূ ইয়ালা ইবন ইমরান বাজালী থেকে, তিনি মখম ইবন সানী থেকে এবং তিনি নিজের পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, নবী করীম ﷺ এর জন্মের রাত্রিতে পারস্য রাজের প্রাসাদে ভূকম্পন হয়। ফলে চৌদ্দটি গম্বুজ ভূমিসাৎ হয়ে যায়। পারস্যের মহা অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়ে যায়, যা এক হাজার বছর ধরে অনির্বাণ ছিল। সারা হ্রদ শুকিয়ে যায়। ভোরবেলায় পারস্য রাজ আতঙ্কিত হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, এ বিষয়টি উযীরদের কাছে গোপন রাখা ঠিক হবে না। সে মতে তিনি মুকুট পরিধান করে সিংহাসনে বসলেন। সকলকে একত্রিত করে পরিস্থিতি বর্ণনা করলেন। এমনি মুহূর্তে সংবাদ এল যে, অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়ে গেছে। সম্রাট খুবই দুঃখিত হলেন। প্রধান পুরোহিত বলল, ঈশ্বর সম্রাটকে সালামত রাখুন। আমিও আজ রাতে স্বপ্ন দেখেছি যে, শক্ত উট আরবী ঘোড়াকে টেনে আনছে এবং দজলা পার হয়ে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন, পুরোহিত, এবার কি হবে? সে বলল, আরবের দিক থেকে কোনো বিরাট ঘটনা সংঘঠিত হবে। এরপর সম্রাট নুমান ইবন মুনযিরকে লিখলেন, কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি তাকে কিছু প্রশ্ন করব। নুমান আবদুল মসীহ ইবন আমর ইবন হাসসান গাসসানীকে দরবারে পাঠিয়ে দিল। সম্রাট তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জানো, আমি তোমাকে কি জিজ্ঞেস করতে চাই? সে বলল, বাদশাহ জাহাপনা বলুন। সঠিক জবাব জানা থাকলে আমি বলে দিব। নতুবা যে জানে, তার ঠিকানা বলে দিব। সম্রাট তাকে সবকিছু খুলে বললেন। আবদুল মাসীহ বলল, আমার মামা সাতীহ এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। তিনি

সিরিয়ার প্রান্ত দেশে বাস করেন। সম্রাট বললেন, তাকে নিয়ে এস। আমি তাকেই জিজ্ঞাসা করব। আবদুল মাসীহ রওয়ানা হয়ে সাতীহের কাছে পৌঁছল। সে তখন মরণোন্মুখ। আবদুল মাসীহ সালাম করলে সে মাথা তুলল এবং বলল, আবদুল মাসীহ একটি দ্রুতগামী উটে সওয়ার হয়ে সাতীহের কাছে এসেছে, যার মৃত্যু আসন্ন। তোমাকে সাসানীদের সম্রাট প্রেরণ করেছে। কেননা, রাজপ্রাসাদে ভুকম্পন হয়েছে। পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়ে গেছে। প্রধান পুরোহিত স্বপ্ন দেখেছে যে, শক্ত উট আরবী ঘোড়াসমূহকে টেনে নিচ্ছে এবং দজলা পার হয়ে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। হে আবদুল মাসীহ, যখন তিলাওয়াত বেশি হতে থাকে, লাঠি বাহক আত্মপ্রকাশ করে, সামাদাহ উপত্যকা পানিতে টগবগ করতে থাকে, সারা হ্রদ শুকিয়ে যায় এবং পারস্যের অগ্নিকুণ্ড শীতল হয়ে যায়, তখন সাতীহের জন্যে সিরিয়া নয়। ব্যস গম্বুজের সম সংখ্যক সম্রাট হবে এবং যা হবার হয়ে যাবে। একথা বলে সাতীহ মারা গেল। আবদুল মাসীহ ফিরে এসে সম্রাটকে সমস্ত ঘটনা বলল। শুনে সম্রাট বললেন, যতদিনে আমাদের চৌদ্দজন সম্রাট হবে, ততদিনে কতকিছু হবে কে জানে। কিন্তু চৌদ্দজনের মধ্যে দশজন সম্রাট তো চার বছরের মধ্যেই অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অবশিষ্ট চারজন হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। ইবন আসাকির বলেন, এ হাদীসটি গরীব শ্রেণিভুক্ত।

খারাইতী ও ইবন আসাকির উরওয়া থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, ওয়ারাকা ইবন নওফেল, যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়েল, উবায়দুল্লাহ ইবন জাহশ, উসমান ইবন হুওয়াইরিস প্রমুখ কুরাইশ নেতা এক রাতে এক প্রতিমার কাছে সমবেত হন। তারা দেখলেন যে, প্রতিমাটি উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তারা একে খারাপ মনে করে সোজা করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর সেটি আবার সজোরে পড়ে গেল। তারা আবার সোজা করে দিলেন। কিন্তু তৃতীয়বার আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। উসমান ইবন হুওয়াইরিস বললেন, অবশ্যই কিছু একটা ঘটেছে। এটা ছিল নবী করীম ﷺ এর জন্মের রাত্রি। এ স্থলে উসমান এই কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, হে মূর্তি, তোর কাছে দুরদুরান্ত থেকে আগত আরব সরদারগণ রয়েছেন। আর তুই উল্টে পড়ে আছিস। ব্যাপার কি বল? তুই কি খেলা করছিস? আমাদের দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে থাকলে আমরা স্বীকার করি এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি। আর যদি তুই লাঞ্ছিত ও পরাভূত হয়ে মাথা নত করে থাকিস, তবে তুই প্রতিমাদের সরদার ও রব নয়।" এরপর তারা প্রতিমাটি পুনরায় খাড়া করে দিলেন। এরপর সেটির ভিতর থেকে আওয়াজ এলো, এ প্রতিমা ধ্বংস হয়ে গেছে সে শিশুর কারণে, যার নূরে সমগ্র বিশ্ব আলোকময় হয়ে গেছে। তার আগমনে সকল প্রতিমাই ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। রাজ-রাজড়াদের অন্তর তার ভয়ে কেঁপে উঠেছে। পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নিভে গেছে। ফলে পারস্য সম্রাট খুবই মর্মাহত হয়েছেন। অতিন্দ্রীয়বাদীদের কাছ থেকে তাদের জিনেরা উধাও হয়ে গেছে। এখন তাদেরকে কেউ সত্য-মিথ্যা খবর পৌঁছাবে না। হে বনূ কুসাই, পথভ্রষ্টতা পরিত্যাগ করো এবং প্রকৃত সত্যের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নাও।

খারাইতী হিশাম ইবন উরওয়া থেকে, তিনি নিজের পিতা থেকে, তিনি তার দাদী আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, যাইদ ইবন আমর ইবন নুফায়ল ও ওয়ারাকা ইবন নওফেল বলেছেন, আমরা মক্কা থেকে আবরাহা প্রত্যাবর্তন করার পর আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, হে কুরাইশগণ! সত্য বল, তোমাদের মধ্যে এমন কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করেছে কি, যার বাপ তাকে বলীদান করার ইচ্ছা করেছিল? এরপর লটারির মাধ্যমে আরও অনেক উট যবেহ করে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল? আমরা বললাম, হ্যাঁ, এরূপ শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল। নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জানো কি, সে পরে কি করেছে? আমরা বললাম, সে আমিনা নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তাকে গর্ভবতী রেখে ইন্তিকাল করেছে। সম্রাট আবার প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জানো, গর্ভের এই শিশু জন্মগ্রহণ করেছে কি না? জবাবে ওয়ারাকা বললেন, আমি এক রাতে এক প্রতিমার কাছে ছিলাম। আমি সেটির ভিতর থেকে এই আওয়াজ শুনেছি, নবী পয়দা হয়ে গেছেন। সম্রাটেরা লাঞ্ছিত হয়েছে। গোমরাহি দূর হয়ে গেছে এবং শিরক মিটে গেছে। এরপর প্রতিমাটি উপুড় হয়ে পড়ে গেল। যাইদ বললেন, হে বাদশাহ! আমার কাছেও এমনি ধরনের খবর আছে। আমি সেই পবিত্র রাতে স্বপ্নযোগে আবূ কুবাইস পাহাড়ে পৌঁছে এক ব্যক্তিকে আকাশ থেকে অবতরণ করতে দেখলাম তার দুটি সবুজ পাখা ছিল। সে কিছু সময় আবূ কুবাইস পাহাড়ে অবস্থান করে মক্কায় এসে বলল, শয়তান লাঞ্ছিত হয়েছে, মূর্তিপূজা খতম হয়ে গেছে। 'আল-আমীন' জন্মগ্রহণ করেছেন। এরপর সে একটি কাপড় খুলে পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে দিল। আমি দেখলাম, কাপড়টি সমগ্র আকাশের নীচে তাঁবুর মতো হয়ে গেল। এরপর একটি নূর উদিত হলো, যার চাকচিক্যে আমার চক্ষু ঝলসে গেল। এসব দেখে আমি ভীত হয়ে গেলাম। এ গাইবী আওয়াজকারী আপন পাখা নাড়া দিল এবং কা'বার উপর পতিত হলো। এরপর একটি নূর উদিত হলে মক্কার ভূখণ্ড উদ্ভাসিত হয়ে গেল। সে বলল, ভূপৃষ্ঠ পবিত্র হয়ে গেছে এবং সে তার সজীবতা উদগীরণ করেছে। এরপর সে কা'বা গৃহে রক্ষিত প্রতিমাদের প্রতি ইশারা করলে সেগুলো ভূমিসাৎ হয়ে গেল।" নাজ্জাশী বললেন, এখন আমার কথা শুনো। আমি সে রাতেই আমার শয্যায় নিদ্রিত ছিলাম। স্বপ্নে দেখি হঠাৎ মাটি ভেদ করে একটি গ্রীবা ও মাথা বের হলো। সে বলল, হস্তীবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে। আবাবীল পাখি তাদেরকে কংকর নিক্ষেপ করে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। পাপী-অপরাধীদের আশ্রয়ও খতম হয়ে গেছে। নবী মক্কী জন্মগ্রহণ করেছেন। এখন যে তার কথা মানবে, সে সফলকাম হবে। আর যে অবাধ্য হবে সে ধ্বংস হবে। এতটুকু বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি চিৎকার করতে চাইলাম; কিন্তু আমার মুখ দিয়ে আওয়াজ বের হলো না। আমি পালাতে চাইলাম; কিন্তু দাঁড়াতে পারলাম না। এরপর আমার গৃহের লোকজন আমার কাছে এসে গেল। আমি তাদেরকে বললাম, হাবশী লোকদেরকে আমার সম্মুখ থেকে সরিয়ে দাও। তারা তাই করল।

তাবারানী, আবূ নুআইম, খতীব ও ইবন আসাকির হযরত আনাস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার পরওয়ারদিগার আমাকে এক সম্মান এই দান করেছেন যে, আমি খতনা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছি। কেউ আমার গুপ্ত অঙ্গ দেখেনি।

ইবন সা'দ ইউনুস ইবন আতা থেকে, তিনি হাকাম ইবন আবান থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবন আব্বাস (রা.) থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা হযরত আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, নবী করীম ﷺ নালকাটা ও খতনা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। আবদুল মুত্তালিবের কাছে বিষয়টি অভিনব মনে হয়। ফলে তার দৃষ্টিতে নবী করীম ﷺ এর মর্যাদা বেড়ে যায়। তিনি বললেন, আমার এই বৎসের বিরাট শান হবে। শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে।

[ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) এর লিখিত ও মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত 'খাসাইসুল কুবরা' থেকে সংকলিত।]

হাদীসের আলোকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা

আল্লামা ইউসুফ ইবন ইসমাঈল আন নাবহানী



সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। সালাত ও সালাম আমাদের সরদার সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরাম সকলের প্রতি।

নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণভাবে বিনয়ীদের সরদার ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তাঁর স্বীয় মর্যাদা সম্পর্কে অনেক বর্ণনাও এসেছে। এগুলো মূলত দ্বীনেরই অংশ, যা তাঁর জন্য প্রচার করা আবশ্যক ছিল এবং গোপন করা বৈধ ছিল না, যাতে তাঁর উম্মত তাঁর উন্নত মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারে আর তাঁর প্রতি তাদের সম্মান ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এটা তো দ্বীনের অন্তর্গত বিষয়। তাছাড়া তাঁর কথা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: "তিনি আপন প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। তিনি যা বলেন তাতো ওহী, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়।"

ইমাম শাআরানী তদীয় 'আল ইয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, শাইখ মুহিউদ্দীন (র.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি প্রথম শাফাআতকারী এবং তাঁর শাফাআত প্রথম গৃহীত হবে। তিনি এরূপ সুসংবাদ প্রদান করেছেন এজন্য যে, যখন কিয়ামতের মহান দিনে এক নবীর নিকট থেকে আরেক নবীর নিকট যেতে যেতে মানুষ পেরেশান হবে তখন সেই পেরেশানী থেকে যেন আমরা মুক্ত থাকতে পারি। প্রত্যেক নবীই (সেদিন) বলবেন, নাফসী, নাফসী—হায়, আমার কী হবে? হায়, আমার কী হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উক্ত হাদীসের মাধ্যমে) আমাদের জানাতে চাচ্ছেন কিয়ামতের সে (ভয়াল) দিনে তাঁর মাকাম কী হবে? যাতে আমরা তাঁর পালা আসা পর্যন্ত স্ব-স্ব স্থানে নিশ্চিন্তে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারি। সেদিন তিনি বলবেন: আনা লাহা, আনা লাহা—আমিই এর (শাফাআতের) যোগ্য, আমিই এর (শাফাআতের) যোগ্য। যার নিকট এ হাদীস পৌঁছেনি কিংবা পৌঁছলেও সে তা ভুলে গেছে সে পেরেশানীর মধ্যে থাকবে এবং এক নবীর নিকট থেকে আরেক নবীর নিকট যেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যার নিকট এ বর্ণনা পৌঁছেছে এবং এটা সে কিয়ামত পর্যন্ত আঁকড়ে রেখেছে তার অবস্থা এর বিপরীত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাত ও সালাম, উম্মতের প্রতি তাঁর কতইনা দয়া!

উক্ত হাদীসের শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন যে, এতে আমার কোনো অহংকার নেই। অর্থাৎ আমি নবী ও অন্যান্য সকল আদম সন্তানদের সরদার বলে অহংকার করছি না। এ বর্ণনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো, আমার সাথে আল্লাহ তাআলার কৃত অঙ্গীকারের আলোকে কিয়ামতের দিনের পেরেশানীতে তোমাদের আশ্বস্থ করা যে, আমিই প্রথম শাফাআত করবো এবং আমার শাফাআতই প্রথম গৃহীত হবে। সুতরাং (দেখা যাচ্ছে) এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উত্তম উদ্দেশ্যে নিজের মহত্ত্ব বর্ণনা করেছেন।

প্রিয়নবীর মর্যাদা সম্পর্কে এরূপ কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

পবিত্র বংশধারার অধিকারী

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি হলাম মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন আবদিল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আবদে মনাফ ইবন কুসাই ইবন কিলাব ইবন মুররা ইবন কা'ব ইবন লুআই ইবন গালিব ইবন ফিহর ইবন মালিক ইবন নদর ইবন কিনানাহ ইবন খুযাইমাহ ইবন মুদরিকাহ ইবন ইলিয়াস ইবন মুদার ইবন নিযার ইবন মা'দ ইবন আদনান। যখনই মানুষ দুভাগে বিভক্ত হয়েছে তখন আল্লাহ আমাকে তাদের উত্তমভাগে রেখেছেন। আমি আমার পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছি। জাহিলিয়াতের কোনো কলঙ্ক আমাকে স্পর্শ করেনি। আমি আদম (আ.)

থেকে শুরু করে আমার পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত (প্রত্যেক স্তরে) বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে এসেছি; (কোনো যুগে বা কোনো স্তরে) ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে বংশের দিকে সর্বোত্তম, পিতৃপুরুষের দিক থেকেও সর্বোত্তম। (বাইহাকী, দালাইলুন নবুওয়াহ)

তাঁর নূর প্রথম সৃষ্টি

হযরত জাবির ইবন আবদিল্লাহ আল আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন, আপনি আমাকে জানিয়ে দিন যে, আল্লাহ তাআলা সকল কিছুর আগে কোন জিনিস সৃষ্টি করেছেন?

উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, হে জাবির, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সকল কিছুর আগে তাঁর নূর থেকে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সে নূর আল্লাহর কুদরতে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করতে লাগলো। সে সময় লাওহ, কলম, বেহেশত, দোযখ, ফেরেশতা, আসমান, যমীন, চন্দ্র, সূর্য, মানুষ, জিন কিছুই ছিল না। এরপর যখন আল্লাহ সৃষ্টিকুল সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন তখন এ নূরকে চারভাগে বিভক্ত করলেন। প্রথম ভাগ দ্বারা কলম, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা লাওহ এবং তৃতীয় ভাগ দ্বারা আরশ সৃষ্টি করলেন। অতঃপর চতুর্থ ভাগকে আরো চারটি ভাগে বিভক্ত করলেন। এর প্রথম ভাগ দ্বারা আরশ বহনকারী ফেরেশতা, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা কুরসী এবং তৃতীয় ভাগ দ্বারা অন্যান্য ফেরেশতাদের সৃষ্টি করলেন। এরপর এ চতুর্থ ভাগকে আবার চারভাগে বিভক্ত করলেন। এর প্রথম ভাগ দ্বারা আকাশরাজি, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা পৃথিবীসমূহ এবং তৃতীয় ভাগ দ্বারা বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি করলেন। অতঃপর চতুর্থ ভাগকে আরো চার ভাগে বিভক্ত করলেন। এর প্রথম ভাগ দ্বারা মুমিনদের চোখের নূর ও দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা তাদের অন্তরের নূর সৃষ্টি করেছেন। আর এটিই হলো আল্লাহর মা'রিফত। আর তৃতীয় ভাগ দ্বারা তাদের উনসের নূর সৃষ্টি করলেন। আর এটাই হলো তাওহীদ, যার সারকথা হলো- আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। (ইমাম আবদুর রায্যাক এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

তিনি সৃষ্টির শুরু থেকে নবী

পবিত্র কুরআন মাজীদে এসেছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ হলেন শেষ নবী। আর ইমাম বাগাভী 'শরহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে হযরত ইরবাদ ইবন সারিয়াহ (রা.) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি তখন থেকেই আল্লাহর নিকট শেষ নবী হিসাবে নির্ধারিত যখন আদম (আ.) খামিরের মধ্যে ছিলেন।

তিনি সৃষ্টির মূল

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন হযরত আদম (আ.) আপন ত্রুটি সম্পর্কে বুঝতে পারলেন তখন বললেন, হে আমার রব, আমি আপনার নিকট হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওসীলা নিয়ে দুআ করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তাআলা বললেন, হে আদম, তুমি কিভাবে মুহাম্মদ ﷺ-কে চিনলে? অথচ আমি তাকে সৃষ্টি করিনি? আদম (আ.) বললেন, হে আমার রব, যখন আপনি আমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলেন, আমার মধ্যে রূহ ফুঁকলেন, তখন আমি মাথা উত্তোলন করে দেখলাম আরশের স্তম্ভে লেখা: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে, আপনি আপনার নামের সাথে আপনার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টির নামই যুক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বললেন, হে আদম, তুমি সত্য বলেছ। নিশ্চয় তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। যেহেতু তুমি তাঁর ওসীলা নিয়ে দুআ করেছ সেহেতু আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। যদি মুহাম্মদ ﷺ না হতেন তাহলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না। (বাইহাকী, দালাইলুন নবুওয়াহ; হাকীম, আল মুস্তাদরাক। ইমাম বাইহাকী হাদীসটি সহীহ বলেছেন।)

সর্বদিক থেকে তিনি সর্বোত্তম

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি যুগ পরিক্রমায় আদম সন্তানদের সর্বোত্তম যুগে প্রেরিত হয়েছি। সর্বশেষ আমি এ যুগে আবির্ভূত হয়েছি। (সহীহ বুখারী)

ইমাম মুসলিম ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-এর সন্তানদের মধ্যে কেনানাকে নির্বাচিত করেছেন, আর বনূ কেনানা থেকে কুরাইশকে নির্বাচিত করেছেন, কুরাইশ থেকে বনূ হাশিমকে নির্বাচিত করেছেন আর বনূ হাশিম থেকে আমাকে নির্বাচিত করেছেন।

ইমাম আবূ নুআইম ও তাবারানী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে, তিনি জিবরীল (আ.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত জিবরীল (আ.) বলেন, আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম ঘুরে বেড়ালাম কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ-এর চেয়ে উত্তম কোনো ব্যক্তি পাইনি এবং বনূ হাশিম থেকে উত্তম কোনো বংশ পাইনি।

তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টি

হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত জিবরীল (আ.) নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আপনার রব বলেছেন, আমি ইবরাহীম (আ.)-কে খলীল হিসাবে গ্রহণ করেছি আর আপনাকে হাবীব হিসাবে গ্রহণ করেছি। আমি আপনার চেয়ে উত্তম কোনো সৃষ্টিকে সৃষ্টি করিনি। আপনার সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করার জন্য আমি দুনিয়া ও এর অধিবাসীকে সৃষ্টি করেছি। (ইবন আসাকির)

তিনি কুফুর বিনাশকারী ও শেষ নবী

হযরত জুবাইর ইবন মুতঈম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মদ (সর্বাধিক প্রশংসিত), আমি আহমদ (সর্বাধিক প্রশংসাকারী), আমি মাহী (বিনাশকারী), যার মাধ্যমে আল্লাহ কুফুরের বিনাশ সাধন করেন। আর আমি হাশির (একত্রকারী), কিয়ামতের দিন মানুষকে আমার পায়ের কাছে একত্রিত করা হবে। আর আমি আকিব (শেষে আগমনকারী), আমার পরে আর কোনো নবী নেই।

আল্লাহর নামের সাথে তাঁর নামও স্মরণ করা হয়

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, জিবরাইল (আ.) আমার কাছে এসে বললেন, নিশ্চয় আমার ও আপনার রব আপনাকে বলছেন: হে নবী আপনি কি জানেন, আমি কিভাবে আপনার স্মরণকে সুউচ্চ করেছি। আমি বললাম: আল্লাহই অধিক জানেন। আল্লাহ বললেন, যখন আমাকে স্মরণ করা হয় তখন আপনাকেও আমার সাথে স্মরণ করা হয়। (তাবারানী ও ইবন হিব্বান)

[আল্লামা ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল আন নাবহানী কর্তৃক সংকলিত 'আল আরবাঈন ফী ফাদাইলি সায়্যিদিল মুরসালীন' থেকে মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান কর্তৃক অনূদিত।]

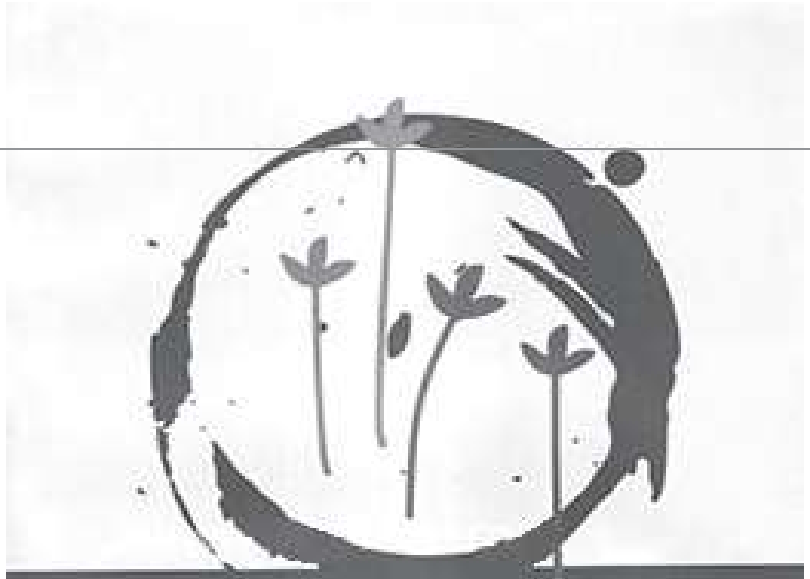

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কিছু বৈশিষ্ট্য

সায়্যিদ মুহাম্মদ ইবনু আলাভী আল মালিকী (র.)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এবং পেছনে সমান দেখতেন

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি মনে করো আমার কিবলাহ শুধু এই দিকে? আল্লাহর কসম! তোমাদের রুকূ-সিজদাহর কোনো কিছুই আমার কাছে গোপন থাকে না। নিশ্চয় আমি আমার পেছন দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই।

ইমাম মুসলিম হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে লোকজন! আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং তোমরা আমার আগে রুকূ-সিজদাহ বা উঠা-বসা কোনো কিছু করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার সামন থেকেও দেখি, পেছন থেকেও দেখি।

ইমাম আব্দুর রাযযাক তাঁর 'আল মুসান্নাফ' এ হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের সামনে যা আছে তা যেভাবে দেখি অনুরূপ পেছনে যা আছে তাও দেখি।

আবূ নুআইম হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পেছন থেকেও দেখি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু দেখতেন এবং শুনতেন, যা আমরা দেখি না বা শুনি না

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না, আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। আকাশ কট কট শব্দ করছে, আর সে এই শব্দ করার উপযুক্ত। আকাশের মধ্যে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও ফাঁকা নেই যেখানে ফিরিশতাগণ মাথা অবনত করে সিজদায় পড়ে থাকেননি। আল্লাহর কসম! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে এবং বেশি করে কাঁদতে, বিছানায় তোমরা স্ত্রীদের উপভোগ করতে না, পথে-প্রান্তরে বেড়িয়ে পড়তে এবং আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করতে। হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, আমার মন চায় যে আমি একটি গাছ হয়ে যাই আর সেই গাছটি কেটে ফেলা হোক!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বগল মুবারকের শুভ্রতা

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম তিনি দুআয় তাঁর হাত তুলেছেন। এ সময় তাঁর বগল মুবারকের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল।

ইবন সাদ হযরত জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদাহ দিতেন তখন তাঁর বগল মুবারকের শুভ্রতা দেখা যেত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বগল মুবারকের উজ্জ্বলতা বর্ণনায় সাহাবীদের এক দল থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুহিব্ব আত তাবারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য হলো, অন্যান্য মানুষের বগল থেকে তাঁর বগল মুবারক আলাদা হওয়া। কেননা সাধারণ সকলের বগল বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে (কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বগল মুবারক ছিলো সাদা-উজ্জ্বল)।

ইমাম কুরতুবী (র.) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করে আরেকটি অংশ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বগল মুবারকে কোনো পশম ছিলো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাই উঠা থেকে মুক্ত ছিলেন

ইমাম বুখারী (র.) তাঁর তারীখে, ইবন আবী শাইবাহ তাঁর মুসান্নাফে এবং ইবন সাদ বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইবন আসাম্ম বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোদিন হাই তুলেননি। ইবন আবী শাইবাহ মাসলামাহ ইবন আব্দিল মালিক থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোদিন হাই তুলেননি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘাম মুবারকের সুগন্ধ

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং কাইলুলাহ করলেন (দুপুরের বিশ্রামের জন্য কিছু সময় ঘুমানো)। তাঁর শরীর মুবারক থেকে ঘাম ঝরছিলো। আমার মা একটি বোতল নিয়ে আসলেন এবং তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘাম সংরক্ষণ করতে লাগলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘুম ভেঙ্গে গেলে জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে সুলাইম! এটা কী করছ? উম্মে সুলাইম জবাব দিলেন, আপনার ঘাম আমাদের সুগন্ধির বোতলে রাখছি। কেননা ইহা সর্বোত্তম সুগন্ধি।

হযরত আনাস (রা.) এর অন্য বর্ণনায় আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাড়িতে আসতেন এবং কাইলুলাহ করতেন। (নবীজি কোনো একদিন কাইলুলার জন্য আসলে) উম্মে সুলাইম তাঁর জন্য মাদুর বিছিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে কাইলুলাহ করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীর মুবারক থেকে অনেক ঘাম বের

হচ্ছিলো। উম্মে সুলাইম সেগুলো আতরের বোতল ও অন্যান্য শিশিতে জমা করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে চাইলেন, উম্মে সুলাইম! এগুলো কী করছ? তিনি জবাব দিলেন, আপনার ঘামের দ্বারা আমি আমার আতরের ঘ্রাণকে আরো বাড়িয়ে নিব।

রাসূল ﷺ এর উচ্চতা

বাইহাকী, ইবন আসাকির এবং আবূ খাইসামাহ তাঁর তারীখে বর্ণনা করেন, হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আকৃতির দিক থেকে অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না। তিনি যখন একাকী হাঁটতেন তখন তাঁকে মাঝারী আকৃতির মনে হতো। তিনি যখন লম্বা মানুষদের সাথে হাঁটতেন তখন তাঁর উচ্চতা তাদেরকে ছাড়িয়ে যেতো। উচু স্কন্ধবিশিষ্ট লোকের পাশে দাঁড়ালে তাকে উঁচু মনে হতো। আবার যখন তিনি তাদের থেকে আলাদা হতেন তখন তাকে মাঝারী আকৃতির মনে হতো।

ইবন সাবু 'আল খাসাইস' কিতাবেও এগুলো বর্ণনা করেছেন। তিনি আরেকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো মজলিসে বসা থাকলে মজলিসের সকলের থেকে রাসূল ﷺ এর কাঁধ মুবারক উঁচু মনে হতো।

রাসূল ﷺ এর ছায়া

হাকীম তিরমিযী বর্ণনা করেন, হযরত যাকওয়ান (রা.) বলেন সূর্য বা চন্দ্রের আলোতে নবী করীম ﷺ এর ছায়া পড়ত না।

ইবন সাবু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি হলো মাটিতে তাঁর ছায়া পড়ত না। কেননা তিনি ছিলেন নূর। তাই তিনি যখন সূর্য বা চন্দ্রের আলোতে হাঁটতেন তখনও তাঁর কোনো ছায়া দেখা যেতো না। অনেক আলিম বলেন, রাসূল ﷺ এর ছায়া না থাকার বিষয়টি তাঁর দুআ থেকেও প্রমাণিত হয়। তিনি দুআয় বলতেন 'আল্লাহ আমাকে নূর বানিয়ে দাও'।

মশা-মাছি থেকে নিরাপদ থাকা

কাযী ইয়ায (র.) তার 'শিফা' কিতাবে এবং আযযাফী তার 'আল মাওলিদ' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, রাসূল ﷺ এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর শরীর মুবারকে মাছি বসতো না। ইবন সাবু তার 'আল খাসাইস' কিতাবে উল্লেখ করেন, রাসূল ﷺ এর কাপড়েও মাছি বসতো না। তিনি আরেকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন যে, উকুন জাতীয় কোনো কিছু তাকে কখনো কষ্ট দিতো না।

রাসূল ﷺ এর রক্ত মুবারক

বাযযার, আবূ ইয়ালা, তাবারানী, হাকিম এবং বাইহাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একবার নবী করীম ﷺ এর কাছে আসলেন। তখন নবীজি সিঙ্গা লাগাচ্ছিলেন। সিঙ্গা লাগানো শেষ হলে নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, আব্দুল্লাহ! এ রক্ত নিয়ে যাও এবং এমনভাবে এগুলো ফেলে আসো যাতে তোমাকে কেউ না দেখে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) রক্ত নিয়ে গেলেন এবং নিজে পান করে নিলেন। যখন নবীর দরবারে ফিরে আসলেন তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, রক্ত কী করেছো? হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) বললেন, আমি এমন গোপন স্থানে সেগুলো রেখেছি, আমার বিশ্বাস সকল মানুষ থেকে তা গোপন থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সম্ভবত তুমি রক্ত পান করে নিয়েছ? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার জন্য আফসোস লোকদের থেকে আর লোকদের জন্য আফসোস তোমার থেকে।

সাহাবীরা বলাবলি করতেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) এর শরীরে এতো শক্তি ছিলো নবীজির রক্ত মুবারকের বরকতে।

রাসূল ﷺ এর নিদ্রা

ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, হযরত আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺকে একবার বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতর নামায না পড়েই ঘুমিয়ে যাবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আয়িশা! আমার দুই চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার কলব ঘুমায় না। আবূ নুআইম হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার চোখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, নবীগণের চোখ ঘুমায় কিন্তু তাদের অন্তর ঘুমায় না।

স্ত্রীদের সাথে নবীর একান্ত সাক্ষাত

ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ দিনের অথবা রাতের কোনো এক সময়ে পর্যায়ক্রমে স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতেন। তাঁরা ছিলেন এগারোজন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আনাস (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম 'তিনি কি এতো সামর্থ রাখতেন?' আনাস (রা.) বললেন, আমরা (সাহাবীরা) বলাবলি করতাম যে, তাঁকে ত্রিশজনের শক্তি দেওয়া হয়েছে।

স্বপ্নদোষ থেকে নিরাপদ থাকা

তাবারানী ইকরামার সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে এবং দীনূরী 'আল মুজালাসাহ' কিতাবে মুজাহিদ সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কখনো স্বপ্নদোষ হয়নি। আর স্বপ্নদোষ হয়ে থাকে শয়তানের পক্ষ থেকে।

সারাংশ

উলামায়ে কিরামের অনেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সে সকল বৈশিষ্ট্য কবিতা আকারে সাজিয়েছেন, যা তাঁকে অন্যান্য সকল মানুষের গুণাবলি থেকে আরো মহিমান্বিত করে। যেমন একজন কবি লিখেছেন,

خص نبينا بعشر خصال * لم يحتلم قط و لا له ظـلال

و الارض ما يخرج منه تبتلع * كذلك الذباب عنه ممتنع

تنام عيناه و قلبه لا ينام * يري من خلف كما يري من أمام

لم يتثاءب قط و هي السابعة * ولد مختونا لها تابعــة

تعرفه الدواب حين يركـب * تأتي إليه سريعة لا تـهرب

يعلو جلوسه جلوس الجلساء * صلى عليه الله صبحا و مساء

আমাদের নবীকে দশটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিশিষ্ট করা হয়েছে। তাঁর কখনো স্বপ্নদোষ হয়নি, তাঁর কোনো ছায়া ছিলো না।

তাঁর শরীর থেকে যা বের হতো (প্রশ্রাব-পায়খানা মুবারক) তা মাটি ভক্ষণ করে নিত, অনুরূপ মাছি তাঁর শরীরে বসা থেকে বিরত থাকত।

তাঁর চোখদ্বয় ঘুমাতো কিন্তু অন্তর ঘুমাতো না, তিনি সামনে যেভাবে দেখতেন অনুরূপ পেছনেও দেখতেন।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য হলো তিনি কখনো হাই তুলেননি, তাঁর পরের বৈশিষ্ট্য হলো তিনি খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

তিনি যখন বাহনে চড়তেন তখন পশুগুলোও তাঁকে চিনত, ফলে সেগুলো তাঁর দিকে দৌড়িয়ে এগিয়ে আসতো।

তিনি মজলিসে বসলে সবার থেকে তাঁকে উঁচু মনে হতো। সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর দরূদ প্রেরণ করুন।

[মক্কা মুকাররামার প্রখ্যাত বুযুর্গ, মুহাদ্দিসুল হারামাইন সায়্যিদ মুহাম্মদ ইবনু আলাভী আল মালিকী (র.) এর 'মাফাহীমু ইয়াজিবু আন তুসাহ্হাহা' থেকে মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান কর্তৃক অনূদিত]

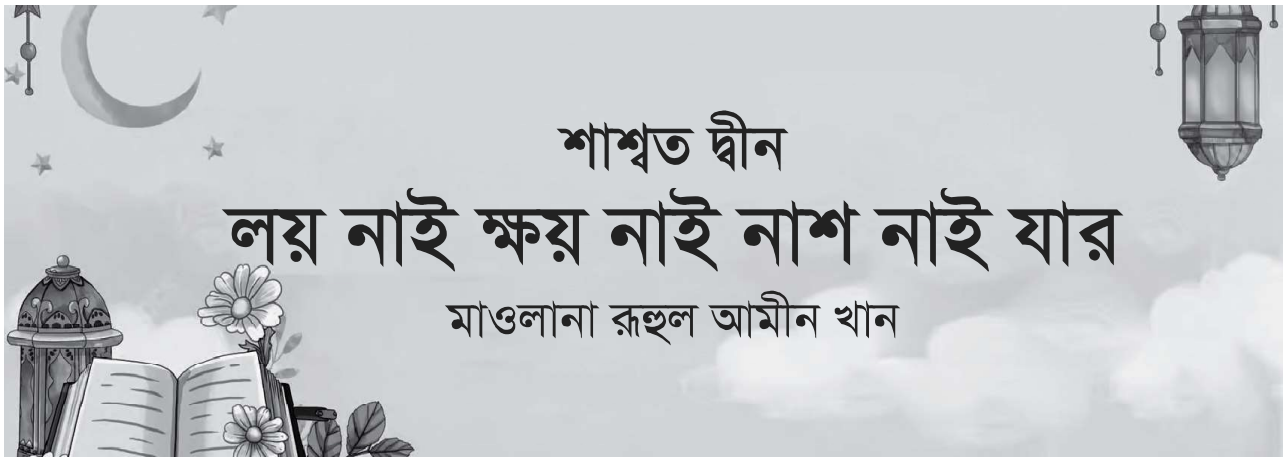

শাশ্বত দ্বীন

লয় নাই ক্ষয় নাই নাশ নাই যার

মাওলানা রুহুল আমীন খান

বদলেগা যামানা লাখ মাগার
কুরআন না বদলা যায়েগা
হ্যায় কাওলে মুহাম্মদ কাওলে খোদা
ফরমান না বদলা যায়েগা
দুনিয়ামে বদলতে রাহতে হ্যাঁয়
ওজারাভি, শাহভি, লিডারভি
ফের শাহে মদীনা মাহে আরব
সুলতান না বদলা যায়েগা
হররোজ বদলতে রাহতে হ্যাঁয়
কুফফার কি পূজা কামারকাজ
মুমিন কা কিবলা কাবা হ্যাঁয়
হরগিজ না বদলা যায়েগা।

এ হচ্ছে একটি উর্দু গজলের অংশবিশেষ। গযলটি কার লেখা বলতে পারব না। ছাত্র জীবনে শুনেছি ওয়ায মাহফিলে, গীত হতে। এর কথা, এর সুর, এর আবেদন বোধহয় মরমে গিয়ে পশেছিল, তাই স্মৃতি একে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, এতোদিনেও হারিয়ে যেতে দেয়নি। গযলের মূল কথা হচ্ছে, যুগ বদলায়, কাল পাল্টায়, সময় পরিবর্তিত হয়। এমনি পরিবর্তন লাখো হচ্ছে, হবে- কিন্তু কুরআন পরিবর্তিত হয়নি, হবে না। যেমন আছে তেমন থাকবে চিরকাল। কারণ, এ কালাম হচ্ছে আল্লাহর কালাম। এর লয় নাই, ক্ষয় নাই, পরিবর্তন নাই, পরিবর্ধন নাই, বিকৃতি নাই। এ কালের প্রভাব থেকে মুক্ত, অবিনশ্বর, শাশ্বত, চিরন্তন বাণী। যেমন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীও চিরন্তন। কেননা, তাঁর কথা খোদারই কথা। তিনি নিজের থেকে কিছুই প্রকাশ করেননি, বলেননি, নির্দেশ দেননি, ফরমান জারি করেননি। তাঁর হুকুম, তাঁর নির্দেশ, তাঁর ফরমান সবই খোদার ওহী, খোদায়ী ফরমান। সুতরাং এও কালের প্রভাব থেকে চিরমুক্ত। এ হচ্ছে মৌলিক, কৃত্রিম নয়। এর মৌলিকত্ব চিরকালই বহাল থাকবে। এ শুধু মুখের কথা নয়, অসার দাবী নয়, এ হচ্ছে ইতিহাস পরীক্ষিত সত্য। হ্যাঁ, কুরআন নাযিলের যামানা থেকেই কাফির-মুশরিকরা, ইয়াহুদী-নাসারারা এর মৌলিকত্ব নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু একটি হরফ, একটি নোক্তা, একটি যের-যবরেরও পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়নি। নিকট অতীতেও ইয়াহুদী-ইসরাঈল চেষ্টা চালিয়েছিল, শব্দ, উচ্চারণ বিকৃত করে হাজার হাজার কপি ছেঁপে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু সে বিকৃতি মোটেই টিকতে পারেনি, মুদ্রণ প্রমাদ মনে করে অল্প দিনের মধ্যেই তা সংশোধন করে নিয়েছে মুসলিম জাতি। কারণ কাগজে ভুল বা বিকৃত মুদ্রণের দ্বারা কুরআনের কিছু আসে যায় না। এ আল্লাহর বাণী সুরক্ষিত রয়েছে লাওহে মাহফুযে, সুরক্ষিত রয়েছে লাখ লাখ হাফিযের সিনায় সিনায়। জিবরাইল ফিরিশতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট থেকে হযরত ঈসা (আ.) এর কাছে যে ইনযীল শরীফ বয়ে নিয়ে এসেছিলেন- সেই অকৃত্রিম খোদায়ী কালাম, এমনকি তার মৌলিক একটি আয়াতও সেই আদি রূপে অবিকৃতভাবে তিলাওয়াত করে শুনাতে পারবে না খৃষ্ট জগৎ। কেননা, তার শত পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়েছে, মানুষের হাতে তার শত বিকৃতি ঘটেছে। তেমনি অবস্থা ঘটেছে হযরত মুসা (আ.) এর নিকট নাযিলকৃত যাবুরেরও- যা ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ। শুধু ইয়াহুদী-নাসারাদের ধর্মগ্রন্থই নয়, দুনিয়ার তাবত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের হাল অবস্থা একই। বিভিন্ন কারণে তার কোনটাই মৌলিক রূপে বহাল নেই। আছে কেবল পবিত্র কুরআন, আছে পেয়ারা নবীর হাদীস। গযলের বাকী কটি পংক্তিতে পেয়ারা নবীর নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব সালতানাত চিরস্থায়ী হওয়া এবং কিবলাহ হিসেবে, কেন্দ্র হিসেবে কাবার স্থায়িত্ব চিরন্তন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অনেক রাজা এসেছেন, বাদশাহ এসেছেন, মহা প্রতাপশালী সম্রাট এসেছেন, বহু দিগ্বিজয়ী বীরের পদভারে পৃথিবী কম্পিত হয়েছে। তারা এসেছেন, গিয়েছেন কারোর নাম ইতিহাসে আছে, কারোর নাম নাই । তবে ফরমান কার্যকর নেই কারোরই। অবশিষ্ট নেই কারোরই সালতানাত। এই সেদিনও লেনিন, স্ট্যালিন, ক্রুশ্চেভ কসিগিন বা গরবাচেভরা ছিলেন কোটি কোটি মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, ভাগ্য বিধাতা, যাদের অঙ্গুলি সংকেতে লাখো মানুষের জীবনাবসান হয়েছে তাদের মূর্তি আজ চূর্ণিত হচ্ছে। যার প্রশংসায় লাখো কণ্ঠ ছিল সোচ্ছার, কোটি কণ্ঠে তাদের দিচ্ছে ধিক্কার, বর্ষণ করছে অভিশাপ। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মাত্র একজন সঙ্গী নিয়ে যিনি নিজ জন্মভূমি থেকে রাতের অন্ধকারে হিজরত করেছিলেন, মাত্র তিনশ তেরজন সঙ্গী নিয়ে যিনি বদরের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দিন যত গিয়েছে তাঁর ফরমাবরদারের সংখ্যা ততই বেড়েছে, তাঁর সালতানাতের পরিধি ততই বিস্তৃত হয়েছে, তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আজ প্রায় দু'শত কোটিতে। আমেরিকা, ইউরোপে, দূরপ্রাচ্যে নিত্য নতুন মানুষ যেভাবে তাঁর ধর্মমত কবূল করে নিচ্ছে তাতে এই সংখ্যা এই শতাব্দী যেতে না যেতেই কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারবে না। মুহাম্মদ (সা.) -এর প্রভাব অপ্রতিরুদ্ধ। যেমনটা ছিল সপ্তম শতাব্দীতে তেমনি বিংশ শতাব্দীতেও। এ প্রভাব আগামী শতকে বাড়বে বই কমবে না। তেমনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনাকেন্দ্র, পূজার বেদী পরিবর্তন হয়েছে শতবার কিন্তু মুমিনের কিবলাহ কাবাই আছে, এর কোন পরিবর্তন নাই। এই যে পথের, মতের, নেতৃত্বের, ফরমানের, কেন্দ্রের কোনই পরির্তন নেই একে কী বলা যায়? এই মৌলিকত্বের নামই কি মৌলবাদ? আর এর অনুসারীরাই কি মৌলবাদী? অন্যান্য ধর্মের কথা বলতে চাই না, মুসলিম মৌলবাদী বা ইসলামী মৌলবাদের সংজ্ঞা কী? যেহেতু কুরআনের কোন পরিবর্তন নাই, হাদীসের কোনো পরিবর্তন নাই, ইসলামী হুকুম-আহকাম নবায়নের কারুর ক্ষমতা নাই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী, আর কোন নবী আসারও কোন সম্ভাবনা নাই। আদি অকৃত্রিম, নির্ভেজাল ইসলাম টিকে আছে, টিকে থাকবে- মুসলমান পরিচয় দিতে হলে এই ইসলামকে কবূল করা ছাড়া, এর বিধান অনুযায়ী চলা ছাড়া দ্বিতীয়

কোন পথ নাই, এখন যারা মৌলবাদের আতঙ্ক ছড়ান, একে পরিহার করার উপদেশ খয়রাত করেন, একে নির্মূল করার হুমকি ধমকি দেন তারা আসলে ইসলামের কোনটা বর্জন করতে বলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। তারা নিজেরাও কি জানেন, ইসলামী মৌলবাদ আর অমৌলবাদ বলতে কী বুঝাতে চান? আমাদের দেশের মুসলিম নামধারী অথচ ইসলাম নির্মূলে তৎপর এমন ব্যক্তিবর্গ বা মহল (যদি নিজেদেরকে মুসলমান বলে স্বীকার করেন) তবে কোন কালিমাটা পড়েছেন? চৌদ্দশ বছর আগের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ নয় কি? তাদের আকীকা, বিয়ে সেই মৌলিক পদ্ধতিতে কি হয়নি? যদি নামায পড়েন তবে কোন পদ্ধতিতে? কোন দিকে মুখ করে? মনে পড়ে, জনৈক নেত্রী পবিত্র কাবায় ওমরা করতে গিয়ে বলেছিলেন, মনে হয় আমি নিজ দেশে রয়েছি এ আমার আপন দেশ। প্রায় চার হাজার মাইল দূরের ভিন ভাষার মরুময় এক দেশ কী করে তার আপন দেশ হল? তার আপনজনের ইন্তিকালের দিনে যে কুরআন তিলাওয়াত করান তাওতো সেই ১৪শ বছর আগেকার নাযিলকৃত কুরআন। তার পার্টির লোকেরা এই যে ভোটের সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে সারা বাংলা মুখরিত করে তুলেন- সেটাও মৌলবাদী শ্লোগান নয় কি? নাস্তিকদের কথা বলছি না। আর তেমন নাস্তিক এদেশে কেউ আছে কি না জানি না- কারণ কমিউনিস্ট পার্টির অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ফরহাদ সাহেবের ইন্তিকালের পর তিনি যে নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, তিনি যে নামায পড়তেন, তিনি যে কুরআন তিলাওয়াত করতেন (অবশ্য এগুলো সবই ইসলামের মৌলিক জিনিস) তা প্রমাণ করার, অন্য কথায় তিনি মুসলিম মৌলবাদী ছিলেন এটা প্রমাণ করার প্রাণান্তকর কোশেশ আমরা দেখেছি। তাহলে কী পরিমাণ আল্লাহ তাআলার কথা মানলে, সে অনুযায়ী চললে মৌলবাদী হয় না এবং কোন সীমা অতিক্রম করলে মৌলবাদী হয়ে যায়- সেই সীমা রেখাটা কী এবং তা নির্ধারণ করে দেবে কে? বাদশাহ ফাহাদের দেশ সাউদী আরবে কুরআন-হাদীসের আইন চলে, চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কেটে দেওয়া হয়েছে, যিনার বদলে করা হয় সঙ্গেসার। নামায-রোযা না করলেও তার জন্য নির্ধারিত শাস্তি ছিলো, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের চোখে এটা কিন্তু মৌলবাদ ছিল না, তার চেয়ে সাউদী আরবও মৌলবাদী দেশ ছিল না, বাদশাহ ফাহাদ নন মৌলবাদী। কিন্তু গাদ্দাফীর লিবিয়া তার চোখে মৌলবাদী দেশ ছিল, মুয়াম্মার গাদ্দাফীও এক মৌলবাদী ব্যক্তিত্ব। যিনি সাম্যের কথা বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন, আগ্রাসনের মুকাবিলায় কামানের ব্যারেল উঁচু করে ধরতে চেয়েছেন। জনগণের মাঝে তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব ও তার বিস্তার দেখে অবশেষ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে হত্যা করে দেশটাকে ধ্বংসের মুখে এনে দাঁড় করেছে। তাহলে ইসলামী মৌলবাদের সংজ্ঞাটা কী দাঁড়াল? তবে কি এটা একটা গরজের ব্যাপার? গরজের কালে এর নাম হবে ধার্মিকতা, এ হবে প্রশংসাই আর ভিন্ন গরজে এ হবে মৌলবাদ, ঘৃণ্য ও নির্মূলীয়? ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের বেলায়ও আমরা তাই দেখেছি। সুবিধাবাদীরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী যখন যে কাজকে ইচ্ছা মৌলবাদ বলবেন, আবার অন্য সুবিধার কথা চিন্তা করে সেই কাজ করে জনগণের কাতারে মিশে ভোট ভিক্ষা করবেন, এই সংজ্ঞা তাদের জন্য প্রিয় হতে পারে, অন্যদের উপায় কী? ঈদে মীলাদুন্নবীর সময় রেডিও-টিভি-সংবাদপত্রে বাণী প্রদানকালে হযরত মুহাম্মদ ﷺ হন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁর প্রদর্শিত পথই হয় মুক্তির মহাসরণী, তাঁর আদর্শের মাঝে নিহিত থাকে ইহ ও পরকালীন শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণ, ঐ সময়টুকু পার হলে কি তিনি আর তা থাকেন না? যারা কেবল বাণী দেবার বেলায় নয়, কেবল ভোটের সময় নয়, খাতনা, বিয়ে, আকীকার ক্ষেত্রে নয়- সর্ব সময়ের জন্যই প্রিয়নবীকে আদর্শ মনে করেন, সে আদর্শ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে চান, যারা কথা ও কাজে এক থাকেন, তারাই তো সত্যিকার আদর্শ মানুষ। এই আদর্শ মানুষ হওয়ার সাধনাই যদি হয় মৌলবাদী হওয়া তবে তো এ পরম গৌরবের। এর বিপরীত করা, বলা, সুযোগ সন্ধানী হওয়া তো চরম মুনাফিকী। আর মুনাফিকদের জায়গা হচ্ছে জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে।

আসলে ইসলামী মৌলবাদ হচ্ছে ইসলামী বিপ্লবের অপর নাম। আর একেই মহাভয় সকল সাম্রাজ্যবাদী, আগ্রাসনবাদী, ঔপনিবেশিক শক্তির। কারণ এই বিপ্লব সফল হলে সকল যুলম, সকল বেইনসাফ; সকল আগ্রাসন, শোষণ-বঞ্চনার সুযোগ যাবে হাতছাড়া হয়ে। তাই এই শক্তি ও তার দেশী-বিদেশী দালালরা একে প্রতিহত করার জন্য এত দিশেহারা। কিন্তু এই যৌবন জল তরঙ্গ রুধিবে কী দিয়ে বালুর বাঁধ? ইসলাম তার বিশ্বব্যাপী মহাবিজয় সম্পন্ন করবেই।

প্রোপ্রাইটর

বেলাল আহমদ

০১৭৫২ ২৮১৯৪০

০১৭৩১-২৫৯০৪৭



এখানে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী ন্যায্যমূল্যে পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

সিলেট মার্কেট, মহাজনপট্টি রোড, কালিঘাট, সিলেট

আজকের বাংলাদেশ ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা

মারজান আহমদ চৌধুরী

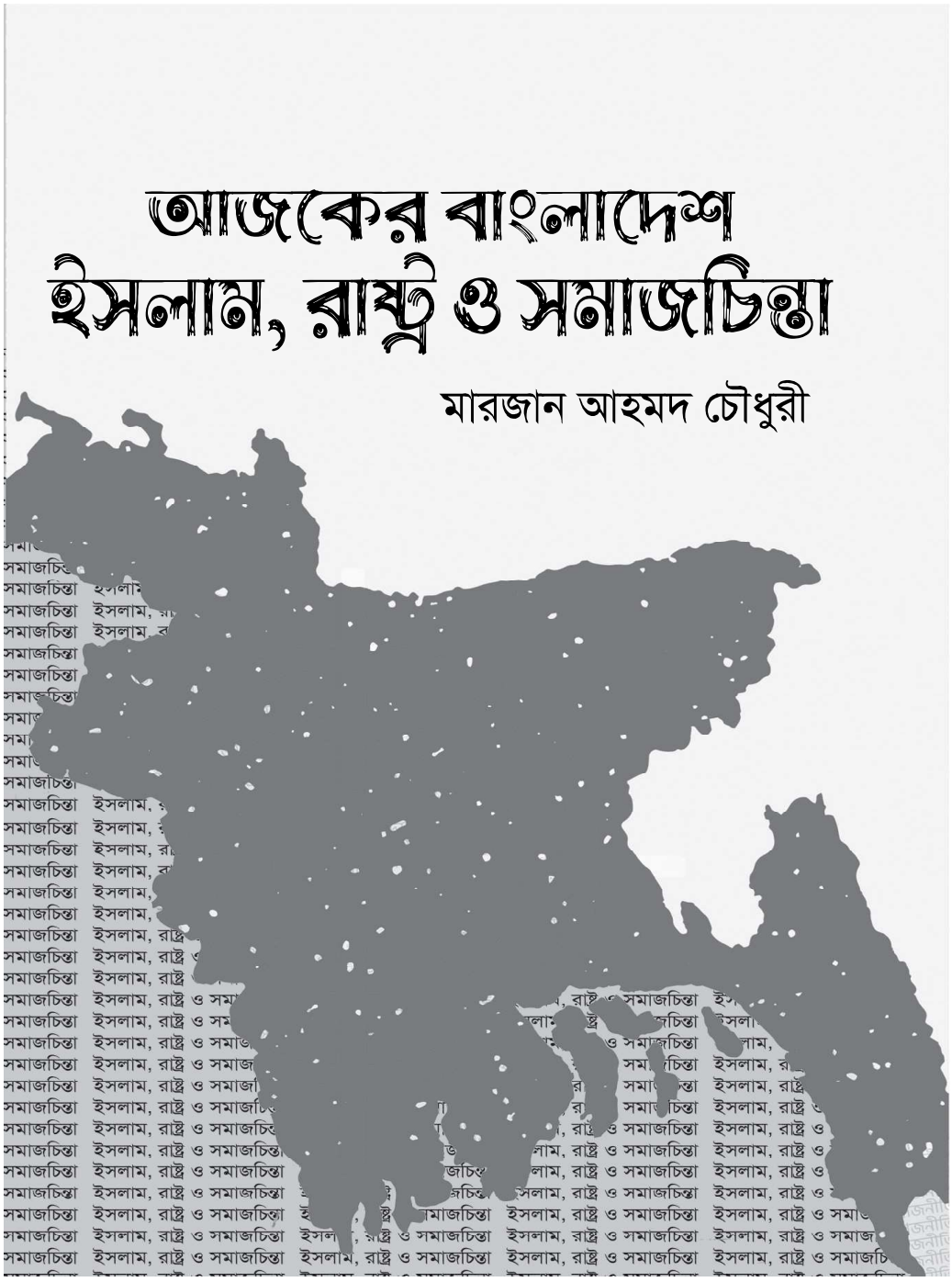

ইমাম কেবল নামাযের ইমাম হয়ে রয়ে যান; সমাজের ইমাম হতে পারেন না। গ্রাম ও আবাসিক এলাকাভিত্তিক যে সামাজিক সংস্থা গড়ে উঠে, খুব কম ক্ষেত্রে তাতে আলিম-উলামার প্রভাব ও নেতৃত্ব থাকে। সমাজে দাড়ি-টুপিওয়ালাদের জনপ্রিয়তা হয়তো আছে, কিন্তু প্রভাব কম। ব্যতিক্রম নেই বলছি না। কিন্তু সেই ব্যতিক্রমও খুব কম। তবে এক্ষেত্রে পীর-মাশাইখের বিষয়টি অনন্য। সমাজে তাঁদের প্রভাব চোখে পড়ার মতো।

জুলাইয়ের রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ এখন একটি উত্তরণপ্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ স্বৈরশাসনের অবসানের পর অনুমিতভাবেই দেশে কিছুটা অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বর্তমানে রাজনৈতিক দল, ছাত্রসমাজ, পেশাজীবি, বুদ্ধিজীবী নানা মহলের নানা আকাঙ্খা মিলিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা বিপুল। আইনজ্ঞদের পক্ষ থেকে সংবিধান পুনঃলিখন; কমপক্ষে সংশোধনের দাবি উঠেছে। ইসলামী দলগুলোর পক্ষ থেকেও নানা চাওয়া-পাওয়ার কথা আসছে। নির্বাচনমুখী ইসলামী দল, অর্থাৎ যারা প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে 'ইসলামী শাসন' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে, তাদেরকে একইসাথে রাষ্ট্র সংস্কারের পরামর্শ ও 'যৌক্তিক সময়ে' নির্বাচনের দাবি নিয়ে নিজেদের পক্ষে জনমত গঠন করতে তৎপর দেখা যাচ্ছে। এতকাল একে অন্যের বিরুদ্ধে অবিরাম অভিযোগের তীর দাগা দলগুলোও ভোটের তালাশে একে অন্যের হাত ধরছে। রাজনীতি এমনই। ভোটের রাজনীতিতে যাহা বাহান্ন তাহাই তেপ্পান্ন। তবে কার প্রত্যাশা কতটুকু পুরোন হবে, তা অবশ্য সময়ই বলে দেবে।

গণতান্ত্রিক ইসলামী দল ছাড়াও আরেকদল ইসলামী তাত্ত্বিকের কাছ থেকে শরীআহ শাসনের জোর আলাপ শোনা যাচ্ছে। যাদের পক্ষ থেকে এধরণের আলাপ আসছে, তাঁরা রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সমর্থক নন। বরং একটি বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশে শরীআহ শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি। বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে শরীআহ কায়িম বা ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার আলাপ বাংলাদেশে একদম নতুন নয়। ক্ষীণস্বরে আগেও হতো, আলিম-উলামা নিজনিজ পরিসরে করতেন। তবে আওয়ামীলীগ আমলে এসব আলাপে মানুষ খুব যুৎ পেতো না। গোয়েন্দা সংস্থা গুম করে ফেলবে, সে আশঙ্কার তো ছিলই; সাথে আরেকটি সমস্যা ছিল। তখন কোনো কথা বলার আগে ভাবতে হতো, কথাটি আওয়ামীলীগ কর্তৃক নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ন্যারেটিভের ভেতর ফিট হচ্ছে কি না!

কারণ ফিট না হলেই জঙ্গি তকমা গায়ে লাগবে । এখন সময় বদলেছে। মুক্তিযুদ্ধ আজও প্রাসঙ্গিক; তবে চেতনার মার্কেটে মন্দা দেখা দিয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আজ অনেকেই প্রকাশ্যে শরীআহ শাসনের প্রয়োজনীয়তা ও এর রূপকল্প নিয়ে কথা বলছেন। লক্ষ-কোটি মুসলমানের মতো আমারও আকাঙ্খা, আল্লাহর দ্বীন ও আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনাদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি পরিসরে প্রতিষ্ঠিত হোক। আমি বিশ্বাস করি, প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে না। এজন্য সে পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যে পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাযিরাতুল আরবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমার এরূপ ভাবনা নতুন কিছু নয়। আগেও বহুবার বলেছি। আজ শরীআহ ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত বর্তমানে যেসব আলাপ হচ্ছে, তার প্রেক্ষিতে কিছু কথা বলব।

ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তার ব্যাপারে মাঝেমাঝে সরলমনা মুসলমানদের মধ্যে এমন বালকসুলভ আবেগের উপস্থিতি দেখতে পাই, মনে হয়, যুগের জটিলতা এরা ঠাহর করতে পারে না। শরীআহ চাই, খিলাফাহ চাই, এই চাই, ওই চাই – যেন কুলকায়েনাত পানদান সাজিয়ে বসেছে আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। আবার ইসলামী তাত্ত্বিকদেরকে শুধু শরীআহ শাসনের উপকারিতা ও এর প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি নিয়ে আলাপ করতে দেখা যায়। এর মুশকিলাত ও বাংলার আবহমান সমাজ-সংস্কৃতির সাথে এর যে কিছু অনিবার্য দেনদরবার সৃষ্টি হবে, তা নিয়ে খুব একটা কথা শোনা যায় না। এ প্রবন্ধে আমি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তার তিনটি অবশ্যম্ভাবী চ্যালেঞ্জ তুলে ধরব, যা নিয়ে কাজ করা উচিত।

প্রথমত, উসমানী সালতানাতের পতনের পর গত একশ বছরে খিলাফতের আদলে বিশ্বে কোনো শরীআহ রাষ্ট্র কায়িম হয়নি। অনেকে আফগানিস্তানের কথা আনবেন। তবে আমাদের দেশের বাস্তবতায় আফগানিস্তানের উদাহরণ কেন প্রাসঙ্গিক নয়, তা পরে বলছি। উল্টো গত এক শতকে যা হয়েছে, তা হলো, বিশ্বজুড়ে ভাষা ও ভৌগোলিকতার ভিত্তিতে বহু আধুনিক জাতিরাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে বললে ভুল হবে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা এসব জাতিরাষ্ট্র গড়ে দিয়েছে। আধুনিক জাতিরাষ্ট্রগুলো গঠনগতভাবে সেক্যুলার। তাই তারা তাদের নাগরিকদের কাছে ধর্মকে শুধু 'ব্যক্তিগত বিষয়' বলেই পরিচয় করিয়ে আসছে । মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেও এটি হয়েছে। ফলে, বেশিরভাগ মুসলমানের কাছে আজ ইসলামী শরীআর ব্যাপকতা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই। বাংলাদেশের কথাই ধরুন। বিশ্বখ্যাত পিউ রিসার্চ সেন্টারের ২০১৩ সালের এক সার্ভে অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৮২% মানুষ শরীআহ শাসন চায়। যদি জানতে চান, শরীআহ শাসন বলতে এরা কী বুঝে? দেখবেন বেশিরভাগ মানুষ শরীআহ শাসন বলতে বুঝে 'হুজুরদের শাসন'। দাড়ি-চাঁছা ওবায়দুল কাদেরের পরিবর্তে দাড়িওয়ালা ওবায়দুল কাদের ক্ষমতায় আরোহন করলেই দেশে ইসলামী শাসন কায়িম হয়ে গেছে ভেবে খুশিতে আটখানা হয়ে যাবে, এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বেশ থেকে বেশ, মানুষ শরীআহ বলতে বুঝে হাতকাটা, দোররা মারা বা এরকম কিছু শাস্তিবিধান। অথচ শাস্তিবিধান শরীআর একটি অংশমাত্র। শরীআহ যে একটি পরিপূর্ণ জীবনদর্শন, চিন্তা-চাহিদার একটি স্বতন্ত্র মানদণ্ড– তা সিংহভাগ মুসলমানের চিন্তায় অনুপস্থিত। আমাদের মানুষ ইসলামপ্রিয়, এতে সন্দেহ নেই। তবে কোন ইসলাম? একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান, নাকি একটি প্রথাসর্বস্ব অলৌকিক ধর্ম? কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া জবাব সম্ভবত দ্বিতীয়টিই হবে। তার ওপর ইসলামী রাষ্ট্র নিয়ে মানুষের উদ্ভট কল্পনার অন্ত নেই। মানুষ ভাবে, ইসলামী রাষ্ট্র হলে পুলিশ রাস্তায় হেঁটে হেঁটে মানুষের দাড়ির দৈর্ঘ্য-প্রস্ত মাপবে, মেয়েদের জবরদস্তি আবায়া পরাবে, মুখে থার্মোমিটার লাগিয়ে দেখবে রোযা রাখছে কি না! অথচ জোর করে কাউকে ধার্মিক বানানো রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে না। এর জন্য সামাজিক শিক্ষা ও দ্বীনি তারবিয়ত আছে।

মোদ্দাকথা হলো, এ দেশের মানুষের কাছে ইসলাম এখনও কিছু বিশ্বাস, প্রাত্যহিক ইবাদত ও রিচুয়ালের ওপরে উঠতে পারেনি। ইসলাম এখনও গতানুগতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এমনকি প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির বিকল্প হিসেবেও মানুষের সামনে হাযির হয়নি। আমরা হাযির করিনি। তাই প্রথমে মানুষের কাছে দ্বীন ও শরীআহ, এর দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদা ও ব্যাপ্তিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। অন্তত একটি প্রজন্ম তৈরি করা উচিত, যাদের কাছে ইসলামী শরীআহ প্রচলিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়মনীতির একটি যৌক্তিক বিকল্প (Viable option) হিসেবে হাযির থাকবে। এটি হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী ধাপে গেলে তা হবে টেকসই। ইসলামী শাসন কেবল প্রতিষ্ঠা করেই তো শেষ নয়, এটিকে টিকাতে হবে। টিকাতে হলে এমন একটি প্রজন্মের সর্বাত্মক সমর্থন লাগবে, যারা জেনেশুনে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের ইসলামপন্থিরা ধর্মীয়ভাবে একজাতীয় (Homogenized) নয়। এখানে বিভিন্ন মাসলাক ও ঘরানার লক্ষ্যণীয় উপস্থিতি আছে। রাষ্ট্রে শরীআহ শাসন কায়িম করার ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসবে, কার শরীআহ কায়িম হবে? কারণ শরীআহ এক হলেও এর ব্যাখ্যায় ভিন্নতা আছে। শরীআহ আইন যেহেতু রাষ্ট্রীয় আইন হবে, তখন শরীআর ব্যাখ্যায় ন্যূনতম একজাতীয়তা তো চাই। নইলে আইন প্রণয়ন হবে কীভাবে? এবার আফগানিস্তানের প্রসঙ্গ আনছি। আফগানিস্তানে এ সমস্যা এতটা প্রকট নয়। ওখানে প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষ মুসলিম, যার মধ্যে ৮৭ শতাংশ সুন্নী। তালেবানসহ আফগানিস্তানের সুন্নী মুসলমানরা প্রায় সবাই মাযহাবে হানাফী। অন্যরাও আছে, তবে খুব নগণ্য। এটি অন্তত তাদের ইসলামী অঙ্গনকে একজাতীয় করে রেখেছে। দ্বিতীয়ত, আফগানিস্তানে পশ্চিমা সংস্কৃতির এতটা প্রভাব বিস্তার হয়নি, যা ইন্টারনেটের কল্যাণে আমাদের দেশে হয়েছে। তৃতীয়ত, আফগান জাতির সমাজ-সংস্কৃতির মাঝেই ইসলাম গেঁথে আছে। ওই সমাজের রীতি-রেওয়াজ আগে থেকেই ইসলামী। এ বিষয়গুলো তালেবানকে আফগানিস্তানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করতে সাহায্য করেছে। এমন নয় যে, ওখানে সব মানুষ তালেবান সমর্থক। তবে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অবশ্যই আছে। বাংলাদেশে শরীআহ শাসনের আলাপকালে এটি ভাবার প্রয়োজন আছে যে, শরীআর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ন্যূনতম একজাতীয়তা আনা যায় কীভাবে। নইলে শরীআহ শাসন সংক্রান্ত আলাপগুলো কেবল সেমিনারের হাততালি আর ওয়ায মাহফিলের 'ঠিক কি না'-তে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে।

তৃতীয়ত, শরীআহ ও রাষ্ট্র নিয়ে আলাপকালে সমাজ ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে পাশ কাটিয়ে গেলে হবে না। জেনে রাখা উচিত, রাষ্ট্র সমাজকে সৃষ্টি করে না; উল্টো সমাজ তার প্রয়োজনে রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করে। মানুষ যখন একত্রে বসবাস করে, তখন আপনাআপনি একটি সমাজ গড়ে উঠে। প্রত্যেক সমাজের কিছু অলিখিত নিয়মনীতি থাকে, যার দ্বারা সমাজ টিকে থাকে। বাগড়া বাঁধে তখন, যখন কেউ এসব নিয়মনীতি ভঙ্গ করে। প্রশ্ন আসে, কেউ সমাজের নিয়মনীতি ভঙ্গ করলে তার বিচার কে করবে? সমাজের তো সেরকম কোনো ফোর্স নেই, অথোরিটি নেই। সমাজের মানুষ দোষী ব্যক্তির সাথে সামাজিক সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারে। কিন্তু এটি তো কোনো যৌক্তিক বিচার নয়। তাছাড়া সমাজের সবাই যদি এক ব্যক্তির ওপর অবিচার করে, তখন ব্যক্তির নিরাপত্তা কে নিশ্চিত করবে? এসব প্রয়োজন মেটানোর জন্য দরকার হয় একটি প্রতিষ্ঠানের, যার শক্তি আছে এবং যা সমাজের কেন্দ্রে অবস্থান করে সমাজের মানুষকে নিরাপত্তা দেবে, বিচার করবে। এ প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে রাষ্ট্র। সমাজের ভেতর থেকে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, তা-ই হচ্ছে রাষ্ট্র। বলা হয়, Society is natural and instinctive, and the state is the creation of will and reason. অতএব অবধারিতভাবে, যে সমাজে যে আদর্শ লালিত হয়, সে রাষ্ট্রেও ওই আদর্শের প্রতিফলন ঘটে।

প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের সমাজ কি ইসলামের আদর্শ দ্বারা লালিত? আমাদের সামাজিক

প্রতিষ্ঠানগুলো কি ইসলামপন্থিদের দ্বারা প্রভাবিত? আমার মতে, পুরোপুরি নয়। ধর্মীয় কাজ তথা ইমামতী, মাদরাসার শিক্ষকতা, ওয়ায মাহফিল ইত্যাদি বাদ দিয়ে শুধু সামাজিক ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে, আমাদের ইসলামী ব্যক্তিবর্গ এখনও সমাজের মূল নিয়ন্তা নন। এখনও সামাজিক পরিসরে হুযুরদের ডাক পড়ে উদ্বোধনী তিলাওয়াত, পরিশেষে মুনাজাত, আকীকা, বিয়ে পড়ানো বা কুলখানি টাইপের কাজে। দুঃখের বিষয়, ইউরোপ-আমেরিকার মতো ধর্মহীন সমাজেও বর-কনেকে বিয়ের জন্য পাদ্রীর কাছে চার্চে যেতে হয়। পাদ্রী কারও বাড়িতে যায় না। অথচ উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে দেখা যায়, পাঞ্জাবি-টুপি পরা কাজী সাহেব রেজিস্ট্রার খাতা বগলে নিয়ে বিয়ের সেন্টার থেকে সেন্টারে দৌড়াদৌড়ি করছেন। বিষয়টি সমাজে হুজুরদের দুরাবস্থা সুক্ষ্মভাবে জানান দেয়। আমাদের ইমামগণ পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ানো ছাড়া সারাদিন বেকার বসে থাকেন। না একটি ব্যবসা করেন, না সামাজিক কাজে অংশ নেন। তাই ইমাম কেবল নামাযের ইমাম হয়ে রয়ে যান; সমাজের ইমাম হতে পারেন না। গ্রাম ও আবাসিক এলাকাভিত্তিক যে সামাজিক সংস্থা গড়ে উঠে, খুব কম ক্ষেত্রে তাতে আলিম-উলামার প্রভাব ও নেতৃত্ব থাকে। ইসলামী ব্যক্তিবর্গ সামাজিক কাজ বা কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণেও অমনোযোগী। এর ফলে সমাজে দাড়ি-টুপিওয়ালাদের জনপ্রিয়তা হয়তো আছে, কিন্তু প্রভাব কম। ব্যতিক্রম নেই বলছি না। কিন্তু সেই ব্যতিক্রমও খুব কম। তবে এক্ষেত্রে পীর-মাশাইখের বিষয়টি অনন্য। সমাজে তাঁদের প্রভাব চোখে পড়ার মতো।

তাই সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামী ব্যক্তিবর্গ, উলামা-মাশাইখ, ইমাম, ইসলামী রাজনীতিবিদ ও দাঈদের প্রভাব বৃদ্ধি করলে একসময় সে প্রভাব রাষ্ট্রেও বিস্তার করবে। এমন নয় যে, সমাজকে প্রভাবিত করলে রাষ্ট্র আপনাআপনি প্রভাবিত হয়ে যাবে। এর জন্য আলাদা করে চেষ্টা করতে হবে, সেটি গণতান্ত্রিক হোক কিংবা বিপ্লবী। তবে যদি সমাজ ইসলাম ও ইসলামপন্থিদের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তাইলে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সহজ ও টেকসই হবে।

এই যে তিনটি চ্যালেঞ্জের কথা বললাম– মানুষের কাছে শরীআর ব্যাপকতাকে স্পষ্ট করার মাধ্যমে একটি প্রকৃত ইসলামী প্রজন্ম তৈরি করা, ন্যূনতম ধর্মীয় একজাতীয়তা নিশ্চিত করা এবং ইসলামকে সমাজের প্রভাবক শক্তি হিসেবে হাযির করা–এগুলো নিয়ে প্রথমে কাজ করতে হবে। এছাড়া আরেকটি সামাজিক সূত্র মনে রাখতে হবে যে, একটি সমাজে নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব হুট করে পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু 'সিস্টেম' হুট করে পরিবর্তন হয় না। হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে ক্ষণিকের জন্য নেতৃত্ব বা কর্তৃত্বের শূন্যতা দেখা দিয়েছে সত্য, কিন্তু দেশের সিস্টেমে শূন্যতা আসেনি। দেশের রাজনীতির সিস্টেম ছিল গণতন্ত্র, এখনও তা-ই আছে। অর্থনীতি ছিল ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ, এখনও তা-ই আছে। আমাদের সামাজিক চিন্তা, আমাদের খাসলত আগে যা ছিল, এখনও তা-ই আছে। দেশে একটি স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থান হয়েছে; আমূল পরিবর্তনকারী বিপ্লব হয়নি। তাই ইসলামপন্থিদের এটি মনে করার কারণ নেই যে, নেতৃত্বের শূন্যতায় কেউ তাঁদেরকে এনে বসিয়ে দেবে। না, এক গণতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তে আরেক গণতান্ত্রিক সরকারই আসবে। ইসলামপন্থিদেরকে নিজেদের মতাদর্শ কায়িম করতে হলে সমাজের প্রচলিত সিস্টেমকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করতে হবে, এরপর রাষ্ট্রগঠন তাঁদের জন্য সহজ হবে। এর আগে জোরপূর্বক নিজের মতাদর্শ (সেটি যত ভালো হোক) চাপিয়ে দেওয়ার চিন্তা করাও বিপদজনক। চাপিয়ে দেওয়া কোনো কিছু মানুষ বেশিদিন সহ্য করে না। শেখ হাসিনার শাসনামল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আমার মতে, ইসলামপন্থি, ইসলামী তাত্ত্বিক ও দাঈদের সামনে এখন চারটি মূল কাজ। প্রথম কাজ হচ্ছে, দাওয়াতী মেজাযে ইসলামী শরীআহ, এর দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদা ও ব্যাপ্তিকে মানুষের কাছে তুলে ধরা। আম মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য জুমআপূর্ব আলোচনা ও ওয়াযের ময়দান উপযুক্ত। আবার ইন্টেলিজেন্সিয়াকে আকৃষ্ট করতে বই ও ম্যাগাজিন প্রকাশ করা, সভা-সেমিনারের আয়োজন করা এবং সর্বোপরি অনলাইন এক্টিভিজম জরুরি। মনে রাখা উচিত, একটি আদর্শ কেবল আম মানুষের কাছে জনপ্রিয় হলেই রাষ্ট্রে সেটি প্রতিষ্ঠিত হবে না, যতক্ষণ না সমাজের ব্রেইন ট্রাস্ট তথা বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে আকৃষ্ট করা যাবে। শেষপর্যন্ত রাষ্ট্র ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এরাই নিয়ে থাকে। একইসাথে কিছু বিশেষায়িত মাদরাসা ও ইন্সটিটিউট গড়ে তুলা উচিত, যেখানে প্রথাগত কারিকুলামের বাইরেও ক্লাসিক ইলম শিক্ষা দেওয়া হবে। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, ইসলামী ব্যক্তিবর্গকে ব্যাপকভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করা। উদাহরণস্বরূপ, ফেনীসহ কয়েকটি জেলায় এবারের বন্যায় ইসলামী ব্যক্তিত্বরা যেভাবে মানুষের সাহায্যে এগিয়ে গেছেন, তাতে সমাজে ইসলামপন্থিদের কতবড় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁরা মানুষের বিশ্বাস জয় করতে পেরেছেন। যুগ যুগ ধরে মানুষের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কারণেই পীর-মাশাইখ সমাজে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন। এভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় ইসলামী ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একইসাথে সুদ ও প্রতারণামুক্ত, ইনসাফভিত্তিক সমবায়ী ব্যবসায় মনোযোগী হওয়া উচিত। এতে ইসলামী অর্থনীতির কার্যকারিতা মানুষের সামনে ফুটে উঠবে। তৃতীয় কাজ হচ্ছে, ইসলামী দল, গ্রুপ, ফোরাম ইত্যাদির মধ্যে বেসিক কিছু বিষয়ে নেতৃত্বের পর্যায়ে একটি বুঝাপড়া নিশ্চিত করা। এজন্য মাঝেমধ্যে একত্রে সেমিনার ও গবেষণাপত্র প্রকাশ করা যেতে পারে। এছাড়া তরুণ ইসলামী এক্টিভিস্টদের জন্য অত্যাবশ্যক কাজ হচ্ছে বুযুর্গ উলামা-মাশাইখের সাথে যোগাযোগ রাখা, তাঁদের সুহবত নেওয়া এবং তাঁদের হিকমতকে কাজে লাগানো। এর সুদূরপ্রসারি ফায়দা আছে। চতুর্থ কাজ হচ্ছে, ইসলামী রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী রাজনীতি করতে চান, তাঁদেরকে আন্তরিকতার সাথে মাঠে রাজনীতি করা উচিত। যদিও এটিকে আমি ইসলাম প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ পথ মনে করি না, তবুও এটি সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয়, তাতে সন্দেহ নেই। তবে এক্ষেত্রে নিজের আদর্শের সাথে আপস করা যাবে না। কোনোভাবেই কোনো সেক্যুলার দলের লেজুড়বৃত্তি করা যাবে না। সেক্যুলার দলের লেজুড়বৃত্তি করে অকালে নষ্ট হয়ে গেছে, এমন ইসলামী দলের উদাহরণ উপমহাদেশে ভুরিভুরি। সর্বোপরি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, আজ শরীআহ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখা মানেই দুনিয়ার উল্টো চলা। দুনিয়াতে যাদের সিস্টেম চলছে, তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা। কাজটি সহজ নয়। এর জন্য চাই ঈমানের জোর, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, ত্যাগের মানসিকতা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে সাফল্য দেখা যাবে।

রঙ হোক আপনাদের
ভালোবাসার, ভালো লাগার
মুদ্রণ ও শৈল্পিক কাজের
শিল্পবন্ধু

রঙ প্রিন্টার্স
সৃষ্টিতে শৈল্পিক কারুকাজ

০১৭৪২ ৬২৭৮৭৯
০১৭৬৪ ০৩৬২৯০
rangprinter@gmail.com
rangprintersbd@gmail.com

৩১৭, রংমহল টাওয়ার (৩য় তলা)
বন্দরবাজার, সিলেট



প্রজন্ম জেড বিপ্লব যাদের রক্তে মেশা

হায়দার ইবনে মোকাররাম

> জেনারেশন জেড এর কিশোরদের বড় অংশ আগামী কয়েকবছর বিশ্ব কাঁপানোর মতো শক্তি অর্জন করবে। সেই শক্তি ব্যয় হোক কল্যাণের পথে। বিশেষত মুসলিম তরুণরা ঝুঁকে থাকুক শরীআর দিকে। গড়ে উঠুক হাজারো ইজ্জুদ্দীন আল কাসসাম, যাদের প্রতিরোধে কোন শক্তি কাজে আসবেনা কোন মূর্তিপূজক বা দুর্দান্ত ইয়াহুদী-নাসারা রাষ্ট্রের।

মহাকবি সাদীর ভাষায়, তারুণ্যের আবেগ যখন আসে, যুক্তি তখন তৃণের মতো ভেসে যায়। বাংলাদেশের প্রখ্যাত এক কবি বলেছিলেন, এখন যৌবন যার মিছিলে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময়।

এসব কথাকে স্মরণ করছি তখন, যখন বাংলাদেশের ৩ কোটিরও বেশি তরুণ এক রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশের শাসনক্ষমতা থেকে স্বৈরাচারী সরকারকে হটিয়ে দিয়েছে। কারা এই তরুণ? তাদের প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য কী? প্রজন্মের নামকরণ হয় কিভাবে? অন্যান্য প্রজন্মের পরিচিতি সম্পর্কে আমরা কতটা জানি? জেনে নেয়া যাক এসবের আদ্যোপান্ত।

Generation Z বা প্রজন্ম জেড, যাদেরকে সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলা হয় জেন-জি। মার্কিন পত্রিকাগুলোর বেশিরভাগ তাদের জুমারস নামে অভিহিত করে থাকে। যেহেতু জেন-জি শব্দটি বহুল প্রচলিত, নিবন্ধে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রতিটি প্রজন্মই আগের প্রজন্ম থেকে এগিয়ে থাকে। আর কিছুতে না হোক, প্রযুক্তিতে অবশ্যই। আমাদের বাবাদের তারুণ্য ছিল রেডিওনির্ভর। দেশের রাজনীতি সচেতনতা এবং শৌখিনতা প্রকাশ পেত রেডিও কত মিটার ব্যান্ডের তার উপর। কালক্রমে রাষ্ট্রীয় টিভি, ভিসিপি, ভিসিআর—শেষ পর্যন্ত ক্যাবল টিভি চ্যানেল দেখে কেটেছে দুটি প্রজন্ম। তাঁরা মুঠোফোন ভালো চালাতে জানতেন না।

আমাদের তারুণ্য শুরু বোতাম টেপা মুঠোফোন দিয়ে, বেঁচে থাকতেই অ্যান্ড্রয়েড ফোন আর এআইয়ের কারিশমা দেখা যাচ্ছে। অত্যন্ত জরুরি কোন ব্যাপার ছাড়া টিভিতে খবর প্রায় দেখা হয়না বললেই চলে । তাই এই তরুণদের জীবন ইউটিউব আর গুগলনির্ভর। কিন্তু আমাদের ছেলেদের প্রযুক্তিজ্ঞানের কাছে আমরা নিতান্ত শিশু বলা চলে। প্রযুক্তি জ্ঞানে আমাদের নাতিপুতিরা আমাদের সন্তানদের চেয়ে এগিয়ে থাকবে বলে ধরে নেয়া যায়।

মূলত জেন-জি এমন একটি শব্দবন্ধ, যার আগে আমাদের প্রজন্মের নামকরণ বা কালসীমা নিয়ে তেমন কোনো ধারণা ছিল না। কেবল নাইন্টিজ কিড বা নব্বইয়ের শিশু-কিশোর বলে একটি পরিচয়ের গণ্ডিতে একটি প্রজন্মকে পৃথক করা যেত । তবে এটিও কিন্তু সেই প্রজন্মের নাম নয়। তাহলে তাদের নাম কী? আর বাকিদের নামই-বা কী?

প্রতিটি প্রজন্মের নামকরণ এবং এর শুরু ও শেষের সময়সীমা কোনো সরকারি কমিশন বা গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত নেয় না। বরং বিভিন্ন নাম ও জন্মসাল হিসাব করে প্রস্তাব করা হয় এবং কিছুটা এলোমেলো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিডিয়া ও জনপ্রিয় কথাবার্তায় ধীরে ধীরে ঐকমত্য গড়ে ওঠে। যেহেতু প্রজন্ম প্রায়ই নির্দিষ্ট ঘটনা দ্বারা গঠিত হয়, তাই তাদের মান ও সময়সীমা কখনো কখনো এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৃথক হয়।

তবে মোটাদাগে এটা নিশ্চিত যে ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের ভেতর যাদের জন্ম, তারাই হলো জেন-জি বা জেনারেশন জেড। বর্তমানে এই প্রজন্মের সদস্যদের বয়স ১২ থেকে ২৭ বছর। এই প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য, ভালো দিক, মন্দ দিক নিয়ে অনেক কথা হয়, অনেক গবেষণা ও আলাপও হয়। তার পাশাপাশি এ প্রশ্নও ওঠে, জেড যেহেতু ইংরেজি বর্ণমালার সর্বশেষ বর্ণ, তাহলে জেনারেশন ওয়াই বা এক্সও নিশ্চয়ই আছে। তারা কারা?

সাধারণত ২০ থেকে ২৫ বছর অর্থাৎ দুই যুগের

মতো সময় ধরে একটি প্রজন্ম গড়ে ওঠে। যদিও তাদের শুরু ও শেষের বছরটি বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নির্ধারিত হয়। প্রযুক্তিগত ক্রমবিবর্তন, বিশ্বায়ন ও সভ্যতার উন্নয়নও এ ক্ষেত্রে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Caregivers of America তে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

তাহলে একনজরে একটু জেনে নেওয়া যাক বিভিন্ন প্রজন্মের নাম, তাঁদের জন্মের সময়সীমা ও তাদের দ্বারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত চিত্র।

গ্রেটেস্ট জেনারেশন বা মহত্তম প্রজন্ম: এদের জন্মকাল আনুমানিক ১৯০১ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত এবং এদের বর্তমান বয়স অবশ্যই ৯৫ বছরের বেশি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই প্রজন্মের মানুষদের সবচেয়ে বেশি ভয়াবহতা দেখতে হয়েছে। এই দুই বিশ্বযুদ্ধে ১২ থেকে ২৭ বছর বয়সী প্রায় ৬০ লাখ তরুণ প্রাণ দিয়েছে। ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরে ফিলিস্তিনের তরুণ বিপ্লবী ইজ্জুদ্দীন আল কাসসাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, 'জামিআতুল শুব্বাহাতুল মুসলিমীন' নামে একটি সংগঠন।

সাইলেন্ট জেনারেশন বা নীরব প্রজন্ম: এদের জন্মকাল আনুমানিক ১৯২৮ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এবং এদের বর্তমান বয়স ৭৯ থেকে ৯৪ বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দলোন সাইলেন্ট জেনারেশনের হাত ধরে হয়েছে। এতে ব্রিটিশ এবং ইউরোপীয়দের হাত থেকে স্বাধীন হয় প্রায় ৬৫টি দেশ।

বেবি বুমার্স জেনারেশন: এদের জন্মকাল আনুমানিক ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এবং এদের বর্তমান বয়স ৬০ থেকে ৭৮ বছর। পাক-ভারত যুদ্ধ এই প্রজন্মের হাত ধরে হয়েছিল। মুসলিম তরুণরা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মূর্তিপূজক বাহিনীকে পর্যদুস্ত করে কাশ্মীরের কিছু উর্বর ভূমি দখল করেছিল। মালয়েশিয়া এবং পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল এই সাহসী প্রজন্মের হাত ধরে।

জেনারেশন এক্স: এদের জন্মকাল আনুমানিক ১৯৬৫ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এবং এদের বর্তমান বয়স ৪৪ থেকে ৫৯ বছর। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আমেরিকার স্নায়ুযুদ্ধ এবং ১৯৯১ সালে সোভিয়েতের পতন ঘটে এক্স প্রজন্মের হাত ধরে। জন্ম হয় প্রায় ১৮ টি রাষ্ট্রের। পাশাপাশি রুশ-চেচেন যুদ্ধে মুসলিম বালকরা অসীম সাহসী ভূমিকা রেখে রুশদের পরাভূত করে চেচনিয়াকে স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছিল। যদিও এই স্বাধীনতা দুই বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি।

জেনারেশন ওয়াই বা মিলেনিয়ালস বা সহস্রাব্দ প্রজন্ম: এদের জন্মকাল আনুমানিক ১৯৮১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত। এবং এদের বর্তমান বয়স ২৮ থেকে ৪৩ বছর। এই প্রজন্মেরই যাদের জন্ম আবার ১৯৯০ সালের ভেতরে অর্থাৎ যারা পুরো নব্বই দশকে তাদের শৈশব-কৈশোর পার করেছেন, তাদের বলা হয় নাইন্টিজ কিডস। এদের মা-বাবারা বেশির ভাগই বুমার্স ও জেনারেশন এক্সের সদস্য।

এই প্রজন্ম রাজনীতি সচেতন এবং প্রাথমিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আরব বসন্তের ঝলক দেখিয়ে আরবদের গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মানার পথ দেখিয়েছিল ওয়াই প্রজন্ম। যদিও এই সাফল্য ম্লান হয়ে যায় পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে।

জেনারেশন জেড বা জেন-জি: এদের জন্মকাল ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এবং এদের বর্তমান বয়স ১২ থেকে ২৭ বছর। এদের মা-বাবারা মূলত জেনারেশন এক্স ও ওয়াইয়ের সদস্য। এরা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অত্যন্ত দক্ষ। ফিলিস্তিনের হামাস ও ইসলামিক জিহাদের মুজাহিদদের অধিকাংশ জেনারেশন জেডের সদস্য। আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে উৎসর্গ করে শরীআভিত্তিক রাষ্ট্র কায়িম করা তালিবান তরুণরাও এই প্রজন্মের। শ্রীলঙ্কান বিপ্লবে প্রেসিডেন্ট সিরিসেনাকে পালাতে বাধ্য করা, বাংলাদেশে শেখ হাসিনাকে অবিকল স্টাইলে দেশছাড়া করা এই প্রজন্মের অন্যতম অর্জন।

জেনারেশন আলফা: এদের জন্মকাল আনুমানিক ২০১২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এবং এদের বর্তমান বয়স ০ থেকে ১২ বছর। এদের মা-বাবারা আবার জেনারেশন ওয়াই বা সহস্রাব্দ প্রজন্মের সদস্য। আলফা প্রজন্মের শেষ সময় এখনো নির্ধারিত হয়নি। এই প্রজন্ম এখনো শিশু এবং এদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য ও পরিসংখ্যান এখনো সর্বব্যাপী প্রকাশিত নয়, কাজেই বলা যাচ্ছে না যে, এই সময়কাল শেষ হবে কত সালে।

জেনারেশন জেড বা জেন-জি এর বৈশিষ্ট্য

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার যুগে জেনারেশন জেড বা জেন-জির আবির্ভাব হওয়ায় তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের সাথে তাদের চিন্তাচেতনার দিক থেকে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এই প্রজন্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো-

প্রযুক্তিনির্ভর যোগাযোগ

এই প্রজন্মের তরুণদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক এর সামাজিকীকরণ হয় সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে। সাধারণত তারা নিজেদের প্রতিবেশীর সাথে পরিচিত নয়। তারা পরিচিত তাদের সমতায় থাকা বন্ধুর সাথে। এজন্য এই প্রজন্মের মানুষের মধ্যে আচরণগত বৈচিত্র্য কম লক্ষ্য করা যায়।

প্রযুক্তিগত দক্ষতা

শৈশব থেকে প্রযুক্তির ছোঁয়া পাওয়া এসব তরুণ প্রযুক্তিগতভাবে অত্যন্ত দক্ষ। বিশেষতঃ মোবাইল, ইন্টারনেট, এপস, পাওয়ার পয়েন্ট এবং এডিটিংয়ে তারা অনন্য। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে তাদের রয়েছে প্রাথমিক ধারণা।

অন্তর্মুখী স্বভাব

পরিবারের সদস্যদের থেকে মোবাইল ইন্টারনেটে বেশি সময় দেওয়ায় তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কাজ করে। ছুটির সময় আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার চেয়ে মোবাইল গেমস নিয়ে পড়ে থাকাতেই তাদের স্বাচ্ছন্দ্য।

অপ্রতুল ধৈর্যশক্তি

অল্প সময়ে হাজারো ভিডিও দেখে ফেলা জেন-জি দের ধৈর্যশক্তিতে ব্যপক প্রভাব ফেলে । এজন্য খুব বেশি সময় ব্যয় হয়, এরকম কোন বিষয়ে তাদের আগ্রহ থাকে কম।

প্রাচুর্যে ভরপুর জীবন

এই প্রজন্মের শিশুদের বড় অংশ বেড়ে উঠে পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টির যোগান পেয়ে। পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোর শিশুরা যেখানে খাদ্য না পেয়ে কান্না করতো, প্রজন্ম জেডের শিশুরা সেখানে কান্না করে না খাওয়ার জন্য। সম্পদের দিক দিয়েও এই প্রজন্মের তরুণরা ধন্যাঢ্য। মাত্র ১৯ থেকে ২৭ এর মধ্যেই বিশ্বের ৮ শতাংশ সম্পদ অর্জন করে ফেলেছে এই প্রজন্ম।

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ

একাকী চুপচাপ থাকা এই প্রজন্ম সামাজিক যোগাযোগের কল্যাণে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রায়শই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। বিশেষত রাষ্ট্রীয় অনাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়ে থাকে। সমাধান না হলে তারা নেমে পড়ে রাস্তায়। শ্রীলঙ্কায় সিরিসেনা সরকারের পতন, ফিলিস্তিনে ইসরায়েলী বর্বরতার প্রতিবাদ বাংলাদেশের কোটা আন্দোলনে সরকারের পতন, পাকিস্তানে ইমরান খানের কারাগারে পাঠানোর প্রতিবাদ, কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণের ঘটনায় হওয়া 'রাত দখল' কর্মসূচি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জেনারেশন জেড এর কিশোরদের বড় অংশ আগামী কয়েকবছর বিশ্ব কাঁপানোর মতো শক্তি অর্জন করবে। সেই শক্তি ব্যয় হোক কল্যাণের পথে। বিশেষত মুসলিম তরুণরা ঝুঁকে থাকুক শরীআর দিকে। গড়ে উঠুক হাজারো ইজ্জুদ্দীন আল কাসসাম, যাদের প্রতিরোধে কোন শক্তি কাজে আসবেনা কোন মূর্তিপূজক বা দুর্দান্ত ইয়াহুদী-নাসারা রাষ্ট্রের।

(তথ্যসূত্রঃ বিবিসি বাংলা, প্রথম আলো, দ্যা ইকনোমিস্ট, উইকিপিডিয়া)

মার্কিন নির্বাচন এবং মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে

ট্রাম্প-কমলার রাজনীতি

রহমান মুখলেস

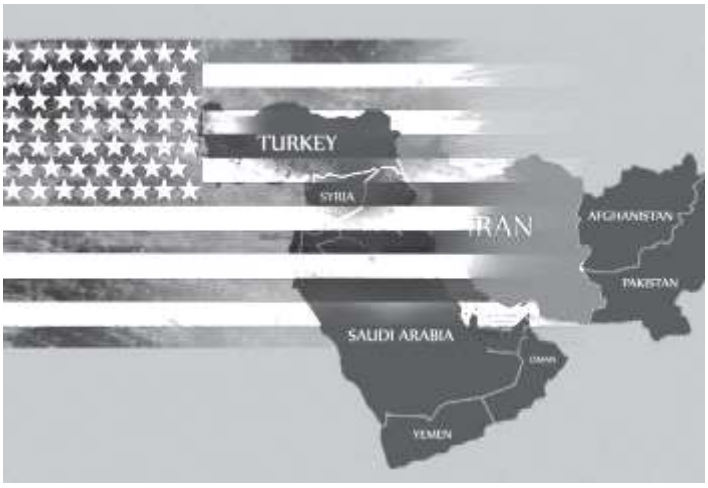

আগামী ৫ নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এ নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে 'মধ্যপ্রাচ্য' নীতি নিয়ে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান পার্টির দুই প্রার্থীর পাল্টাপাল্টি মন্তব্যের লড়াই জমে উঠেছে। সেই সঙ্গে ছুটছে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি। তাঁদের লড়াই জমে উঠেছে 'মধ্যপ্রাচ্য' ও চলমান গাযা যুদ্ধ ঘিরে। রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প– হচ্ছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পুরোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এদিকে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস ইসরায়েলের সাথে ঘনিষ্ঠ হলেও গাযা যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ও ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে তিনি বেশ উদ্বিগ্ন সোচ্চার ।

গাযায় ইসরায়েলি হামলা ১১ মাস গড়িয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যা ৪০ হাজার ছাড়ায়ে গেছে অনেক আগেই। আর এ মৃত্যুর বেশির ভাগই ফিলিস্তিনী নারী ও শিশু।

মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি এখন সত্যিই উদ্বেগজনক। ইতিমধ্যে ইরানে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়ার মৃত্যুতে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি এখন আরও উত্তপ্ত। ইরান এ হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। ইরান ইসরায়েলে হামলা চালালে গাযা যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক যুদ্ধে রূপ নিতে পারে। সংঘাত আরও বড় রূপ নিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী কমলা হ্যারিসের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি (কমলা) জিতলে এর ফল ভালো হবে না।

অন্যদিকে গাযায় অব্যাহত ইসরায়েলি হামলা চান না কমলা হ্যারিস। সদ্য সমাপ্ত ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্মেলনে এ কথা জোর দিয়ে বলেছেন কমলা। একই সঙ্গে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থনও ব্যক্ত করেছেন তিনি। গত ১৯ আগস্ট থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনের সময়ে প্রতিদিনই ফিলিস্তিনের সমর্থনে এবং যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে হাজার মানুষ বিক্ষোভ করেছেন। গাযা যুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতি বাইডেন প্রশাসনের সমর্থনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান তাঁরা। ইসরায়েল নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অনেক সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম ভোটারদের খুশি করতে পারেনি। আর এ জন্য মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি মুকাবিলার বিষয়ে বাইডেন প্রশাসনের সমালোচনায় মুখর ট্রাম্প। ট্রাম্পের ভাষ্য, 'আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগোচ্ছি । বাইডেন প্রশাসন সে দিকেই নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। কমলাও তাঁর ব্যতিক্রম হবেন না।'

ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্মেলন কেন্দ্রের বাইরে গাযা যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ হলেও সম্মেলনের কার্যক্রমে কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি। কমলার আশঙ্কা, মুসলিম ও আরব ভোটের কারণে তিনি মিশিগান, জর্জিয়া ও উইসকনসিনের মতো অঙ্গরাজ্যে পরাজিত হতে পারেন। আর এ কথা মাথায় রেখে তিনি ইসরায়েলের নিরাপত্তা সমর্থনের পাশাপাশি ফিলিস্তিনের জনগণের স্বার্থরক্ষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য দেন সম্মেলনে। তিনি শুধু অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির কথাই বলেননি, ফিলিস্তিনের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পক্ষেও দাবি তোলেন। একই সাথে ফিলিস্তিনের মানবিক চাহিদা পূরণের পক্ষে বক্তব্য দিয়ে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে আসছেন। আর এর মাধ্যমে তিনি ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ এবং সার্বিকভাবে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এদিকে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফররকালে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাতে ট্রাম্প কমলার মধ্যপ্রাচ্য নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসও নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাতকালে তাঁকে (নেতানিয়াহু) জানিয়ে দেন, গাযা বিষয়ে তিনি চুপ থাকবেন না। তবে মানবাধিকার কর্মী ও বিশ্লেষকরা মনে করেন, মার্কিন ভোটাররা ইসরায়েলের সমর্থনে কমলার কাছ থেকে আরও বেশি কিছু আশা করেন।

নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প স্পষ্টত জানিয়ে দেন, 'নির্বাচনে যদি না জিতি, তবে মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের যুদ্ধ বাধতে পারে, যা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপ নিতে পারে। আমরা ইয়াহুদীবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়ে যাব।' পাল্টা গাযা যুদ্ধকে 'বিধ্বংসী' আখ্যায়িত করে কমলা হ্যারিস পরে বলেছেন, 'গাযায় বিপুলসংখ্যক নিরীহ বেসামরিক লোকজনের প্রাণহানিসহ মানুষের দুর্দশার কথা অবশ্যই ইসরায়েলকে বিবেচনা করতে হবে।

কমলা বলেন, ১১ মাস ধরে গাযায় যা হচ্ছে, তা ধ্বংসাত্মক। মৃত শিশুর ছবি এবং মরিয়া ক্ষুধার্ত মানুষ নিরাপত্তার জন্য পালিয়ে যাচ্ছে, কখনো কখনো দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থবারের জন্য বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। অবশ্য একই সাথে ইসরায়েলের প্রতি তাঁর ও তাঁর দেশের সমর্থনের বিষয়েও নিজের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তিনি।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনয়ন পাওয়ার দৌড়ে নেমে ব্যর্থ হয়েছিলেন কমলা হ্যারিস। তিনি পরে প্রার্থিতা পাওয়ার সে প্রচেষ্টা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তার আগে পর্যন্ত কমলা যে প্রচার চালিয়েছিলেন, তাতে কিছু ঘাটতি ছিল। তিনি পরিষ্কার কোনো বার্তা দিতে পারেননি। তখন তাকে কিছু ভুল ও অসমীচীন কথাবার্তা বলতে দেখা গেছে। ওই সময় কমলা ছিলেন সিনেটর। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থিতা পেতে অন্য অনেক মনোনয়নপ্রত্যাশীর মতো কমলাও বামপন্থার দিকে ঝুঁকেছিলেন।

এখন কমলা হ্যারিসের সে অবস্থানগুলোকেই বিরোধীরা সামনে টেনে এনে আক্রমণ করছেন। ট্রাম্প একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন। এর শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'মিট সান ফ্রান্সিসকো র যাডিকেল কমলা হ্যারিস।' এতে ওই সময়ে কমলা হ্যারিস যে নীতিমালাকে সমর্থন দিয়েছিলেন, তার অনেকগুলোই তুলে ধরা হয়েছে।

বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে নেতানিয়াহুর সম্পর্ক বেশ উষ্ণ। বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে গাযার হতাহত নিয়ে নেতানিয়াহুর নানা দ্বিমত রয়েছে, তাতে ইসরায়েলে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহে কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসে দেওয়া ভাষণে নেতানিয়াহু বাইডেন ও ট্রাম্প দুজনের প্রশংসা করলেও তিনি সাবেক প্রেসিডেন্টের (ট্রাম্প) নানা উদ্যোগের কথা বেশি তুলে ধরেছেন।

তবে কমলা ইদানিং যে সুরে কথা বলেছেন, তা বাইডেনের সরাসরি ইসরায়েলপন্থী বিবৃতির চেয়ে আলাদা। ওয়াশিংটন পোস্ট–এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ফিলিস্তিনীদের দুর্দশার বিষয়ে জোর দিয়ে গাযা ইস্যুতে বাইডেনের চেয়ে আলাদা অবস্থান তৈরির করছেন কমলা হ্যারিস। যদিও অধিকারকর্মী হাজামি বার্মাদার মতে, ভাইস প্রেসিডেন্টের সহানুভূতির ওই মন্তব্য গাযা পরিস্থিতিতে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করবে না । বার্মাদা বলেন, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছিলেন, গাযার শিশুদের মুখে নিজের সন্তানকে দেখেন তিনি। তারপরও ব্লিঙ্কেনের দপ্তর কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র ইসরায়েলকে দিয়েই যাচ্ছে।

শেষের কথা

২০২০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনয়ন পাওয়ার দৌড়ে নেমে ব্যর্থ হয়েছিলেন কমলা হ্যারিস। তিনি পরে প্রার্থিতা পাওয়ার সে প্রচেষ্টা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তার আগে পর্যন্ত কমলা যে প্রচার চালিয়েছিলেন, তাতে কিছু ঘাটতি ছিল। তিনি পরিষ্কার কোনো বার্তা দিতে পারেননি। তখন তাকে কিছু ভুল ও অসমীচীন কথাবার্তা বলতে দেখা গেছে। ওই সময় কমলা ছিলেন সিনেটর। আবার এ কথাও ঠিক বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে নেতানিয়াহুর সম্পর্কের উষ্ণতা বেশি।

কমলা হ্যারিস বিষয়ে মানবাধিকার কর্মকর্তাদের অভিমত হচ্ছে, মার্কিন সামরিক ও কূটনীতিক সমর্থনের বিষয়ে ফিলিস্তিন প্রশ্নে বাইডেন ভোটারদের থেকে দূরে সরে গেছেন, আর এর ফলে কমলা হ্যারিস মার্কিন ভোটারদের মন জয় করতে পারবেন না। তাছাড়া অধিকারকর্মীরা মনে করেন, গাযা নিয়ে সহানুভূতি থাকলেও কমলা হ্যারিস বাস্তবে ইসরায়েলকে সামরিক ও কূটনৈতিকভাবে সমর্থন দেওয়ায় মার্কিন নীতিতে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারবেন না। কমলা এটা জোর দিয়ে বলেছেন গাযায় প্রাণহানির সংখ্যা উদ্বেগজনক হলেও ইসরায়েলেরও আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। কমলা হ্যারিসের এমন বক্তব্যে প্রকৃতপক্ষে ক্ষুব্ধ ফিলিস্তিনী অধিকারকর্মীরা।

এ বিষয়ে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর সমাজবিজ্ঞানী এমান আবদেলহাদি বলেছেন, 'গাযার শিশুদের হত্যা বন্ধে সত্যিকার প্রতিশ্রুতি ছাড়া তাঁর (কমলা হ্যারিস) শুধু মৌখিক সহানুভূতিতে কিছু আসে যায় না।' তিনি জোর দিয়ে বলেন, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যে নিষ্ঠুরতা চালানো হচ্ছে, এর দায় যুক্তরাষ্ট্রকে বহন করতে হবে।

এমান আবদেলহাদি আরও বলেন, 'আপনি কারও মাথায় গুলি করছেন, আবার তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন—এমনটা প্রশংসার যোগ্য নয়। বরং প্রয়োজন, ইসরায়েলকে অস্ত্র ও অর্থ দেওয়া বন্ধ করা, যা সক্রিয়ভাবে এসব মানুষকে মেরে ফেলছে। আর এটি করা হলেই তাঁদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো হবে।'

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানরা মার্কিন ভোটারদের মাত্র এক শতাংশ। তা হলেও আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুসলিম সম্প্রদায় একটি একক রাজনৈতিক ইস্যুতে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে এবার অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ। আর সেই ইস্যুটি হলো গাযা যুদ্ধ। ২০২০ সালে যে মুসলমানেরা ডেমোক্রেটিক দলের বড় সমর্থক ছিল, গাযা যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অবস্থানের কারণে তারা এখন তার তীব্র বিরোধীতায় পরিণত। এটা কমলাকেও অগ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। তবে এ কথাও ঠিক মার্কিন মুসলিম ভোটাররা ট্রাম্পের প্রতিও যে ঝুঁকবেন এটাও মনে হয়না। এই মুহূর্তে মার্কিন মুসলিম ভোটারদেরও দাবি গাযা যুদ্ধের অবসান এবং দুই-রাষ্ট্র সমাধানের দিকে যাওয়া। এর কোন বিকল্প নেই।

Al Arab Tailors

আল আরব টেইলার্স

পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট

১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট

01734-346601

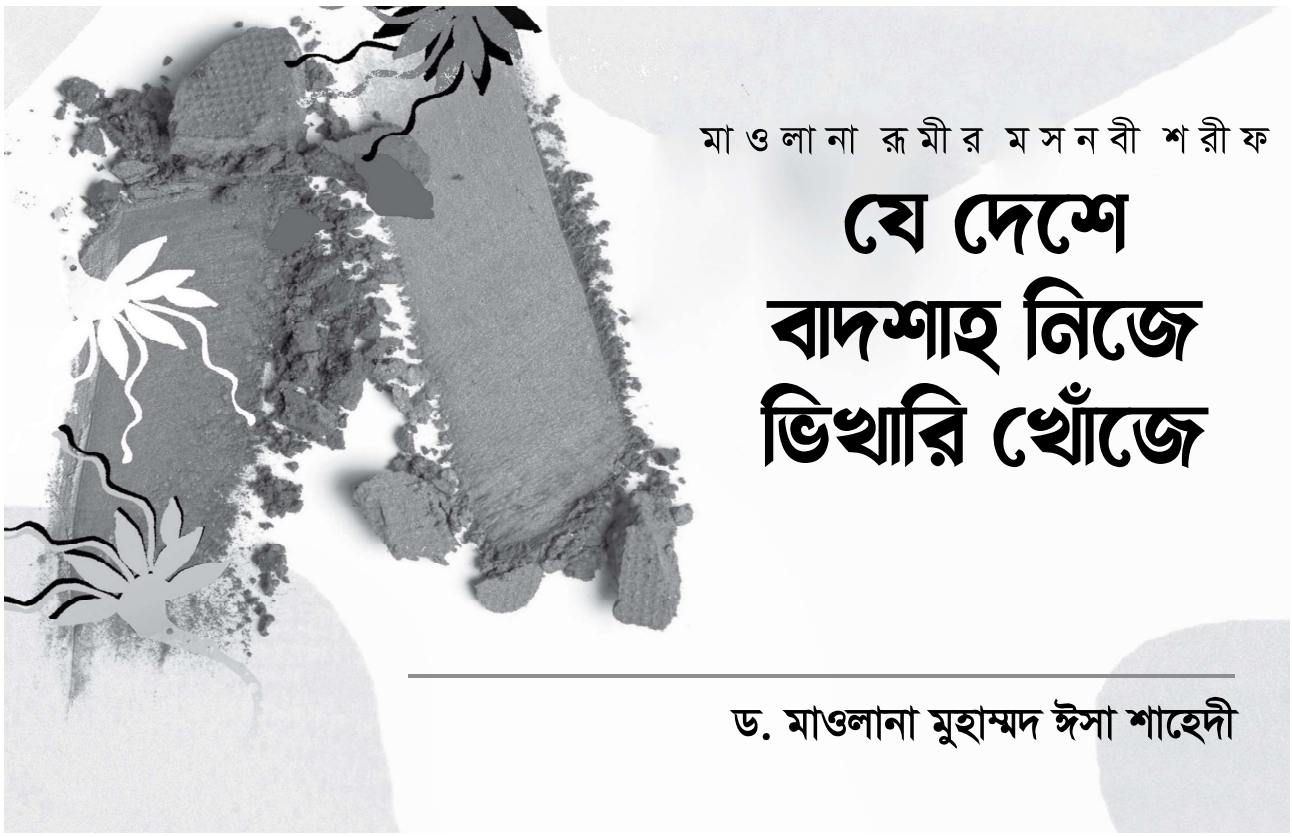

মাওলানা রূমীর মসনবী শরীফ

যে দেশে বাদশাহ নিজে ভিখারি খোঁজে

ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

পানির সুরাহী কাঁধে বেদুইন শেষ পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে গেল বাগদাদে। খলীফার দরবারে গিয়ে দেখে অবাক কান্ড। চারদিকে দান দক্ষিণা বদান্যতার ছড়াছড়ি। অভাবী ও সাহায্যপ্রার্থীরা কিলবিল করছে। মানুষের চাপে তিল ধারণের ঠাঁই নাই কোথাও।

دید درگاهی پر از انعامها
اهل حاجت گسترده دامها

দীদ দারগা'হী পুর আয এনআ'মহা
আহলে হা'জত গুস্তারীদে দা'মহা
দেখল দরবার ভরপুর দয়া-দাক্ষিণ্য-দানে
অভাবী প্রার্থীরা তৎপর নানা কৌশল গ্রহণে।

অভাবীরা আসছে, নানা কৌশলে অফুরান দয়া দান নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। এই দান সবার জন্য অবারিত। সুন্দর-অসুন্দর, ধনী-গরীব বা কাফির-মুমিন সবাই লাভ করছে এই দয়ার উপহার। চারদিকে দানশীলতার বসন্ত বা বর্ষাকাল। দান করা ও দান পাওয়ার উৎসব।

بهر گبر و مؤمن و زیبا و زشت
همچو خورشید و مطر بل چون بهشت

বাহরে গাবরো মুমেনো যীবা ও যেশত
হামচো খোরশীদ ও মাতার বাল চোন বেহেশত
কাফির মু'মিন, সুন্দর কুৎসিত সবার তরে যেমন
অবারিত সূর্য ও বৃষ্টি, এমনকি বেহেশতের মতন।

বাদশাহর দয়াদান কাফির, মুশরিক, মুমিন, মুসলমান, সাদা-কালো সবার জন্য এমনভাবে অবারিত, যেখানকার দৃশ্যপট মনে হচ্ছে বেহেশতের মতো। কোনো কিছুর অভাব সেখানে নেই। বৃষ্টি নামলে তা কেবল ভালো লোক বা মুমিন মুসলমানের ক্ষেত খামারে সেচ দেয় না। কাফির মুশরিকরাও তাতে সমান ভাগ পায়। সূর্যের আলোয় আলোকিত হয় সমগ্র দুনিয়া। কাফির মুমিন কারো মাঝে তফাত হয় না। আল্লাহর এত নিআমতের ছড়াছড়ি দেখলে মনে হয় দুনিয়াটাই বেহেশত। বেদুইন তাকিয়ে দেখছে একদল বাদশাহর দয়া দানে ধন্য। সম্মানের ভূষণে সজ্জিত। আর কিছু অপেক্ষায় আছে মহান মালিকের দয়াদানের আশায়। মাওলানার চিন্তা এখন বাগদাদ ছেড়ে উর্ধ্বলোকে। সবাই যেন মহান রবের মোহতাজ।

خاص و عامه از سلیمان تا بمور
زنده گشته چون جهان از نفخ صور

খা'সো আম্মে আয সুলায়মা'ন তা' বেমূর
যেন্দে গাশতে চোন জাহা'ন আয নাফখে সূর
আম খাস বাদশাহ ফকীর সুলাইমান কিবা পিঁপড়া
প্রাণজাগা কোলাহল শিঙ্গার ফুঁকে বাজে কিয়ামত নাকাড়া।

বাদশাহর দরবারে গিয়ে যারা যাহিরী নিআমতের প্রত্যাশী তারা নানা ধনরত্নে সজ্জিত হয়ে আহ্লাদিত। আর যারা বাতিনী নিআমত প্রত্যাশী তারা এমন ধন পেয়েছে, যা সাগরতুল্য। মণিরত্ন থাকে সাগরতলে। সাগরের মনিরত্ন, এমনকি গোটা সাগর তাদের আয়ত্বে চলে এসেছে। এই সাগর বলতে বাদশাহর সন্তুষ্টি ও সুদৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। বাদশাহর দয়া দানের চেয়ে যদি কেউ বাদশাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও প্রিয়ভাজন হতে পারে তার তো গোটা সাগর আয়ত্বে চলে এসেছে। এই সাগরের বেলাভূমিতে দেখা যায়, যারা সাহসহীন ছিল তারা সাহস ফিরে

পেয়েছে। যারা সাহসী ছিল কত নিআমতই না লাভ করছে।

বেদুইন লক্ষ্য করে, এখানে অভাব বলতে কিছু নেই। এমনকি অভাবীদের খোঁজা হচ্ছে উচ্চকণ্ঠে। মনে হচ্ছে অভাবীরা এখানে ভিখারি নয়, বরং যে বাদশাহ দানের বিরাট ভাণ্ডার নিয়ে আছেন তিনিই অভাবী, অভাবীর খোঁজে তিনি ভিখারী।

بانگ می آمد کہ ای طالب بیا
جود محتاج گدایان چون گدا

বা'ঙ্গ মী আ'মাদ কে আই তা'লেব বিয়া'
জূদ মুহতা'যে গেদা'য়া'ন চোন গেদা'

ডাকছিল আরো, আছো কি কেহ সাহায্য নেয়ার মত
ভিখারীর জন্য ভিখারী আজি দয়ালু খলীফা দেখ।

ভিখারী সাহায্য চায় করুণভাবে। কিন্তু আজ যেভাবে রাজ দরবার থেকে সাহায্য নেয়ার জন্য ডাকা হচ্ছে, মনে হচ্ছে বাদশাহ নিজেই দান করার জন্য ভিখারী। ভিখারী তার মনের কানে শুনতে পেল আরেকটি আহ্বান। সে আহ্বান আরশে আযীমের। হাদীস শরীফে বর্ণিত,

أَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ أَلاَ مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ أَلاَ مُبْتَلِي فَأُعَافِيَهِ

-প্রতিদিন শেষরাতে মহান রব্বুল আলামীন প্রথম আসমানে এসে বলেন, কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী কি আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিতাম। আছো কি কোনো রিযক প্রার্থনাকারী আমি তাকে রিযক প্রদান করতাম। কোনো বিপদগ্রস্ত কি আছো আমার কাছে বিপদমুক্তির প্রার্থনা করবে, আমি তাকে বিপদমুক্ত করে দিতাম।"[১]

আসমান থেকে প্রতি রাতে এভাবে ডাকার কারণ ব্যাখ্যায় মাওলানা একটি রোমান্টিক উপমা দিয়ে বলেন,

جود می جوید گدایان و ضعاف
همچو خوبان کآینہ جویند صاف

জূদ মী জূয়াদ গেদা'য়া'ন ও য়েআ'ফ
হামচো খুবা'ন কা'য়েনে জূয়ান্দ সা'ফ

দানশীলতাই খোঁজে এখানে ভিখারি দুর্বল কারা
রূপসীদের মতো স্বচ্ছ আয়না খুঁজে বেড়ায় তারা।

রূপসীরা আয়না খুঁজে বেড়ায়। কারণ কী? কারণ, নিজের সৌন্দর্য দেখা ও দেখানো। দানশীলরাও ভিখারী খোঁজে নিজের দানশীলতার প্রকাশ ঘটানোর জন্যে। কারণ, রূপসীদের রূপ আয়নায় সুন্দররূপে প্রতিবিম্বিত হয়। আর ভিখারী খুঁজে পেলেই দানশীলতার প্রমাণ রাখা সম্ভব হয়। কাজেই এক হিসেবে ভিখারিরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এ কারণেই আল্লাহ পাক সূরা ওয়াদ্দোহায় তার হাবীবকে বলেন,

پس ازین فرمود حق در والضحی
بانگ کم زن ای محمد بر گدا

পাস আযীন ফারমূদ হক দার ওয়াদ্দোহা'
বা'ঙ্গ কাম যান আই মুহাম্মদ বার গেদা'

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন সূরা ওয়াদ্দোহাতে
ভিখারী মিসকীনদের হাঁকাবে না মুহাম্মদ! কাছ থেকে।

এই বয়েতে ইঙ্গিত করা হয়েছে এ আয়াতের প্রতি:

وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ

-আপনি যাঞ্ছাকারীকে তাড়িয়ে দেবেন না, তাকে ধমক দেবেন না।[২]

বাগদাদের খলীফা এবং মহান আরশের মালিকের দানশীলতার প্রসঙ্গ আসাতে মাওলানা এখানে ভিখারী ও দাতার শ্রেণিভেদ বিশ্লেষণ করতে চান।

এক শ্রেণির দাতা আছে তারা সহজে দান করে না, ধৈর্য ধরার মতো ভাব দেখায়। ভিখারীরা বাধ্য হয়ে তাদের খোঁজে যায়। আর এক প্রকার দাতা আছে তারা ভিখারী আসার আগেই দয়া-দান নিয়ে ভিখারী খোঁজে বের করে। তখন বুঝা যায়, দানশীলতা নিজেই ভিক্ষুক যোগাড় করার জন্য ভিখারী। কারণ, ভিখারী না থাকলে দানশীল দান-দক্ষিণা কীভাবে করত এবং তার দানশীলতার প্রমাণ কীভাবে বাস্তবে রূপায়িত হত। মাওলানা আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলছেন যে,

پس گدایان آینۂ جود حق اند
وانکہ با حقند جود مطلق اند

পাস গেদা'য়া'ন অয়েনেয় জূদে হকান্দ
ওয়াঙ্কে বা' হক্কান্দ জুদে মুতলাক আন্দ

অতএব ভিখারীরা নিদর্শন আল্লাহর দানশীলতার
আর যারা আল্লাহর সাথে তারা স্বয়ং দানশীলতা।

মাওলানা এখানে ভিখারীদের শ্রেণি বিন্যাস করে বলছেন যে, এক শ্রেণির ভিখারী আছে, তারা সত্যিই অভাবী, কিন্তু মানুষের কাছে কাকুতি মিনতি করে হাত পাতে না, তারা আল্লাহর ইচ্ছার উপর ধৈর্য ধরে, আল্লাহর সাহায্যের দিকে চেয়ে থাকে। তাদের প্রশংসা করে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে।

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

-তা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘোরাফেরা করতে পারে না; যাচনা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে; আপনি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবেন। তারা মানুষের নিকট নাছোড়বন্দা হয়ে যাচনা করে না। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ তো তা সবিশেষ অবহিত।[৩]

এ ধরণের অভাবী মানুষকে আল্লাহর দানশীলতার আয়না বলার তাৎপর্য হলো, দুনিয়াবী উপায় উপকরণ জায়যোগাড় না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের রিযকের ব্যবস্থা করেন, তাতে আল্লাহ যে রিযকদানকারী সেই সিফত ও গুণের প্রকাশ ঘটে। এখানেই সৃষ্টিকে দেওয়ার জন্য স্রষ্টার আগ্রহের বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে পড়ে।

এই শ্রেণির অভাবীর বাইরে আরেকটি শ্রেণি আছে যারা মূলত আল্লাহর সাথে আছে অর্থাৎ যাদের চাওয়া পাওয়া বলতে কিছু নাই। নিজের অস্তিত্বকে আল্লাহর মধ্যে বিলীন করে দিয়েছে, নিজের অর্থস্বার্থের কথা ভুলে আল্লাহর দীনের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয় তারা তো ভিখারীর কাতারে নাই। তারা অনেক উর্ধ্বে। তারা দানশীলতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। তাদের সম্পর্কেই হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, ধনসম্পদ না থাকা মানে দরিদ্রতা নয়; বরং প্রকৃত ধনী হচ্ছে, اَلغِنىُ غِنَى النَّفْس 'মনের দিক থেকে কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া।' তারা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত। নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পর আল্লাহর দানশীলতা ও অমুখাপেক্ষীতার গুণ নিজের চরিত্রে ধারণ করেছেন। এই শ্রেণির ফকীরের মর্যাদা প্রথম শ্রেণির ফকীর ও অভাবীর উর্ধ্বে।

وانکہ جز این دوست او خود مردہای است
او برین در نیست نقش پردہای است

ওয়াঙ্কে জুয ইন দোস্ত উ খোদ মুর্দেয়ীস্ত
উ বরীন দার নীস্ত নাকশে পর্দেয়ীস্ত
এই দুই শ্রেণির বাইরে যে সে অন্তর-মরা মুর্দা
সে দরবারে পথ পায়নি, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে পর্দা।

উল্লেখিত দুই শ্রেণির অভাবী বা ফকীরের বাইরে যারা ফকীর তাদের মধ্যে হাকিকী জীবনের কোন চিহ্ন নেই। আল্লাহর কাছে কবূল হওয়ার যোগ্যতা তাদের নেই। এমনকি তারা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে আড়াল স্বরূপ।

অনেকে আছে নিজেদের ফকীর দরবেশরূপে প্রকাশ করে। বলে আমরা ফকীরী জীবন নিয়ে আছি। আল্লাহর কাছে মোহতাজ। আমি সূফী, আমি ফকীর, কাজ করি না, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল নিয়ে চলি। এরা ফকীর নয়, ফন্দিবাজ। আসল ফকীর কে, তার পরিচয় ব্যক্ত করছেন মাওলানা। যাতে সাধারণ মানুষ তাদের খপ্পড়ে পড়ে ধোঁকা না খায়।

মাওলানা প্রকৃত দরবেশের পরিচয় ব্যক্ত করে বলছেন, আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী ও আল্লাহর জন্য তৃষিত ফকীর দরবেশ আর আল্লাহকে ছেড়ে মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষী ও তৃষ্ণার্ত ফকীর দরবেশ উভয়ের মাঝখানে বিস্তর ব্যবধান।

لیک درویشی کہ تشنۂ غیر شد
او حقیر و ابلہ و بی خیر شد.
লে কে দরবীশী কে তেশনেয় গাইর শুদ
উ হাকীর ও আবলাহ ও বী খাইর শুদ
যে দরবেশ লালায়িত আল্লাহ ভিন্ন অন্যের জন্য
সে হীন, তুচ্ছ গর্দভ, যাবতীয় কল্যাণশূন্য।

এরা এমন দরবেশ আল্লাহর কোনো সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠতা এরা লাভ করেনি, আল্লাহর ইবাদতে তারা নিষ্ঠাবান নয়। এদের অন্তরাত্মা হাকীকতের জ্ঞান ও স্বচ্ছতা শূন্য। এরপরও তারা নিজেদের পীর ফকীর দরবেশ বলে জাহির করে। অথচ নামধাম ও অর্থবিত্তের জন্য লালায়িত। এরা গায়ে নেককারদের আলখেল্লা পরে এটুকুই সার।

খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী হাকীকতের জ্ঞান ও রহস্যশূণ্য এসব ছদ্মবেশী দরবেশ সম্পর্কে বলেন, ইদানিং এক প্রকার দরবেশ (সূফী, পীর, বুযুর্গ) পাওয়া যাচ্ছে, যাদের রঙচং ছাড়া আর কিছুই নেই। তাদের আছে আলোর জৌলুস, আড়ম্বরতা, চাকচিক্য মহাধুমধাম, ঢোব তবলার বোল, আছে দোকান পসরা, আমদানীর আয়োজন, হুজরা আছে, মজলিস মাহফিলের ঢাকঢোল, আস্তানার আকর্ষণ, দরবার দিলশাদ, সূফীর আচকান গায়ে, অহংকারে দম্ভে ঢোল। মাথা নেড়া বা চুল ঝাঁকড়া অথচ তাদের আচার ব্যবহারে মানুষের অন্তর ছিন্নভিন্ন। তাদের জামার আস্তিন খাটো, মনে হবে আধ্যাত্মিক রহস্যের সওদা তার আছে, অথচ অবলীলায় আল্লাহর নিষিদ্ধ কজে লিপ্ত সে। দিনরাত কারামাত প্রচার করে বেড়ায় অথচ রাতদিন ঘুমিয়ে কাটায়। তুমি মনে কর বড় বুযুর্গ সে, না না এ হচ্ছে নাফরমান, তার আছে শুধু আস্ফালন, দেখতে আশিকদের মজলিসের বাতি, অথচ অন্তরে অন্দরে ফাসিকদের জ্ঞাতি। তার মাথায় সারাক্ষণ চিন্তা পেট পূজার। আর হিকমতের কথা বলে বেড়ানো তার পেশা।

[১] ইবন মাজাহ, মিশকাত
[২] সূরা দুহা, আয়াত-১০
[৩] সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৩

মাদরাসা-ই দারুল মোস্তফা
MADRASAH-E-DARUL MUSTAFA
আন্তর্জাতিক মানের হিফজুল কুরআন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার
নাজেরা ও নূরানী বিভাগ
হিফজুল কুরআন বিভাগ
হিফজ রিভিশন বিভাগ
ভর্তি চলছে
প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য
আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
তাজবিদ ভিত্তিক বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা।
শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত বৈঠক।
নৈতিক মানোন্নয়নে নিয়মিত আখলাক্বী তা'লিম ও তরবিয়ত প্রদান।
পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা।
রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা।
প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা।
সিসি টিভির মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা
প্রয়োজনে
হাফিজ ফয়েজ আহমদ
প্রিন্সিপাল
০১৭১৬-৮০৫৪৪৭
০১৭৯৮-৫৬১৫২১ (অফিস)
বাসা-২৩, ব্লক-ডি, রোড-১৪, শাহ্জালাল উপশহর, সিলেট

এই মাসে এই চাঁদে



মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী

সুলতান মাহমুদ গজনভীর সোমনাথ জয়

হিন্দুদের একটি পবিত্র স্থানের নাম সোমনাথ। সেখানে তাদের একটি বিরাট মন্দির ছিল। ৫৬টি থাম বা খুঁটিবিশিষ্ট সেগুন কাঠ নির্মিত এই মন্দির । ৬ তলা উঁচু এই মন্দিরের অভ্যন্তরে এক প্রকান্ড মূর্তি স্থাপিত ছিল। এর তিন গজ ভূমির বহির্দেশে এবং দু'গজ ভূমির ভেতরে ছিল। পাথরের খোদাই করা কৃষ্ণবর্ণ এই মূর্তি হীরা-জওহরে সজ্জিত ছিল। হিন্দুদের শিব দেবতা নামে পরিচিত এই প্রতিমাকে অত্যন্ত শক্তিশালী মনে করা হত। তাদের কাছে এটি চন্দ্র দেবতা নামে গণ্য হত। অন্যান্য সকল দেবতা এর অধীনে ছিল। হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী, আত্মাসমূহ দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সোমনাথ মন্দিরে এসে সমবেত হত এবং চন্দ্র গ্রহণের সময় দেবতা যে দেহে ইচ্ছা আত্মা সঞ্চারিত করতো। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারসমূহে সোনালী পর্দা লাগানো ছিল যাতে ঝালরগুলিও মনিমুক্তা খচিত ছিল। প্রত্যহ হাজার হাজার ভক্ত পূজারী মূর্তিকে সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করতে আসত এবং চন্দ্র গ্রহণের সময় তীর্থ যাত্রীদের সংখ্যা হত লাখ লাখ। প্রতিদিন মূর্তিকে গঙ্গার টাটকা পানি দ্বারা গোসল করানো হত। সেখান থেকে সাতশ পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত গঙ্গা নদী হতে পানি আনার জন্য দ্রুতগামী সওয়ার সর্বদা নিয়োজিত থাকত। মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করার জন্য দশ হাজার গ্রামের আমদানী ওয়াকফকৃত ছিল।

সোমনাথ মন্দিরে উক্ত শিবমূর্তি ছাড়াও অসংখ্য সোনালী রূপালী মূর্তি ছিল। মন্দিরের পূজা পাঠের জন্য প্রতিদিন এক হাজার ব্রাহ্মণ নিয়োজিত ছিলেন। গীত ও ভজন গাইবার জন্য মন্দিরে সাড়ে তিনশ গায়ক উপস্থিত থাকত। সুন্দরী দাসী রাজন্যবর্গ ও আমীরদের সুন্দরী কন্যাগণ নাচ, গান ও বিশেষ বিশেষ পন্ডিতগণের সেবায় নিয়োজিত থাকত। এতদ্ব্যতীত দরিদ্র লোকদের কন্যাগণ মন্দির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, খাবার রান্না করার দায়িত্ব পালন করত এবং পরবর্তী স্তরের পণ্ডিতগণের বাসনা পূরণ করত। মন্দিরের আমলা ও যাত্রীদের জন্য তিনশ নরসুন্দর প্রতিদিন উপস্থিত থাকত। সকলকে পদমর্যাদা অনুযায়ী বেতন ভাতা প্রদান করা হত। দুর্গের ভেতরে অবস্থিত বিরাট শহরের আশেপাশে পরিখার প্রাচীর ছিল। দেয়ালও ছিল সুদৃঢ় ও সুউচ্চ। দুর্গের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত থাকত। কেননা সোমনাথ তখন পর্যন্ত সুলতান মাহমুদের অভিযান থেকে নিরাপদে ছিল। এজন্য হিন্দু রাজন্যবর্গের নিরাপত্তার জন্য বিপুল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছিল। রাজা প্রেমদেব ধর্মীয় ও জাতীয় উত্তেজনা সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে। সোমনাথ হতে খবর আসামাত্র প্রত্যেক রাজা সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। মাহমুদের পথরোধ করার লক্ষ্যে কয়েকটি বাহিনী প্রেরণ করে। কয়েকটি স্থানের পথে পথে যোদ্ধা ও রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

গজনী হতে সোমনাথ পর্যন্ত পথ দীর্ঘ হওয়া ছাড়াও অত্যন্ত দুর্গম ছিল। বহু নদী অতিক্রম করা এবং দুশমনের সাথে লড়াই ছাড়াও মরুভূমিও অতিক্রম করা কঠিন ব্যাপার ছিল। সেখানে ঘাস পানিও ছিল না। সুলতান মাহমুদ এত সব প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা সত্ত্বেও সোমনাথ অভিযানের দৃঢ় সংকল্প করেন। তিনি ত্রিশ হাজার পদাতিক বাহিনীসহ গজনী হতে ১৭ অক্টোবর যাত্রা করেন এবং ২০ নভেম্বর মুলতানে উপনীত হয়। সেখান হতে সোজা চুলিস্তান মরুভূমি ও রাজস্থান মরুভূমির কঠিন পথ ধরে আজমীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্বে তিনি যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যুদ্ধ-প্রস্তুতি অনুযায়ী খাদ্য ও পানি বহনকারী ত্রিশ হাজার উট ছাড়াও প্রত্যেকের কাছে অনেক দিনের পানি ও খাদ্য মওজুদ রাখা হয়। প্রত্যেক অশ্বারোহীর জন্য অতিরিক্ত ঘোড়া এবং উটের ব্যবস্থা রাখা হয়। মুলতান হতে সুলতানের সঙ্গে কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক রাখা হয়। সুলতান বিদ্যুৎ গতিতে অগ্রসর হতে থাকেন এবং মরুভূমি অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সৈন্যবাহিনীর জন্য একই রাস্তা অবলম্বন করেন। সোমনাথ পৌঁছা পর্যন্ত সুলতান মাহমুদ তিনটি স্থান জয় করেন। বৃহস্পতিবারে তিনি সোমনাথে পৌঁছেন। তিনি দুর্গ তিনদিক থেকে অবরোধ করেন, জুমুআর দিন মুসলমানগণ আক্রমণ চালিয়ে দুর্গে প্রবেশ করেন। শনিবার খোদ সুলতান দুর্গে প্রবেশ করেন।

মন্দিরের প্রবেশদ্বারে তুমুল যুদ্ধের পর সুলতান মন্দিরে প্রবেশ করেন। তিনি স্বহস্তে প্রধান প্রতিমা ভেঙে ফেলেন। দুর্গের পতন ঘটার পর হিন্দুরা পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গণীমতের মাল মুসলমানদের হাতে আসে।

এটি ছিল সুলতান মাহমুদের ১৬তম অভিযান। ৩২ বছর শাসনকালে তিনি ৪০টি বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কেবল ভারতবর্ষেই ১৭টি অভিযান পরিচালনা করেন এবং সবকটিতে বিজয় সূচিত হয়। তাঁর জন্ম ১০ মুহাররাম ৩৬১ হিজরী মুতাবিক ১ নভেম্বর ৯৭১ খ্রি. এবং মৃত্যু ২১ এপ্রিল ১০৩০ খ্রি.।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

হে আল্লাহ। আমার দেশকে সেইসব অত্যাচারী হতে রক্ষা কর, যারা আমার সিংহাসন দখল করেছে। আমাকে নির্বাসন দিয়েছে। আমার সন্তান-সন্ততিদের হত্যা করেছে এবং হিন্দুস্থানকে গোলামে পরিণত করেছে । ৮৮ বছর বয়স্ক শেষ মুঘল সম্রাট রেঙ্গুনে অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যুকালে গভীর অনুতাপ অনুশোচনা করে উপরোক্ত কথাগুলি ব্যক্ত করেছিলেন।

রাজদরবারে বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর কিভাবে ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন, তার করুণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যেদিন তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল, মূলতঃ সেদিনই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজরা পাঞ্জাবের শিখ রাজ্যগুলির সৈন্যবাহিনী সহকারে দিল্লী অবরোধ করে এবং ভীষণ গোলাবর্ষণ করে দিল্লী শহর ও কেল্লা জয় করতে সক্ষম হয়। বৃদ্ধ সম্রাট মীর্জা এলাহী বখশের কুপরামর্শে হুমায়ুনের সমাধিস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এই সংবাদ মীর্জা এলাহী বখত ইংরেজদেরকে জানিয়ে দিয়েছিল। সংবাদ পেয়ে ইংরেজরা হুমায়ুনের সমাধি ঘেরাও করে ফেলে এবং সহজেই সেখান হতে বৃদ্ধ সম্রাটকে গ্রেফতার করে। এটি ১৮৫৭ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের ঘটনা। সেখান হতে তারা বাহাদুর শাহকে জিনাত মহলে নিয়ে যায়। শাহজাদাগণকে গ্রেফতার করা হয়। রক্ষী বাহিনীর কর্নেল হুন্তসেল শাহজাদাগণকে তাদের পিতার সামনেই নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। ইংরেজরা বাহাদুর শাহের প্রতিও কোনরূপ করুণা প্রদর্শন না করে তাঁকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দিয়ে সেখানে অন্তরীণ রাখে। সেখানে তাঁর সাথে ছিলেন বেগম জিনাত মহল, জওয়ান বখত, শাহ আব্বাস এবং বেগম তাজমহল সহ রাজপরিবারের আরও কয়েকজন মহিলা। সড়ক ও সমুদ্রপথে তাঁদের রেঙ্গুনে পৌঁছতে ২ মাসেরও বেশি সময় লেগেছিল। উর্দু ভাষার এই কবি সম্রাট বাহাদুর শাহ রেঙ্গুনেই ইন্তিকাল করেন।

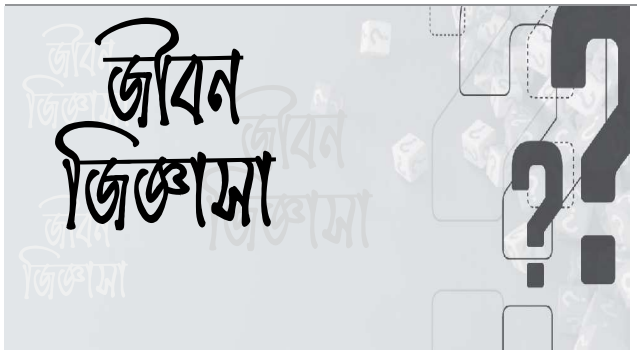

জবাব দিচ্ছেন-
মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার
প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা

শাফিয়া তাফাদার
মিশিগান, ইউ.এস.এ

প্রশ্ন: কারো গুম হওয়ার কারণে তার স্ত্রী কয়েক বছর অপেক্ষার পর অন্যত্র বিবাহ বসার পর প্রথম স্বামী ফিরে আসলে উক্ত স্ত্রীর শরীআতসম্মত বিধান কি? সে কি পরবর্তী বিবাহে বহাল থাকবে, নাকি পূর্বের স্বামীর নিকট ফিরে যাবে?

জবাব: কোনো মেয়ের স্বামী নিখোঁজ হয়ে গেলে এবং তার কোন খোঁজ পাওয়া না গেলে উক্ত স্বামী থেকে তার স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানোর শরীআতসম্মত পদ্ধতি হলো, প্রথমে দেখতে হবে উক্ত মেয়েকে তালাকের অধিকার দেওয়া হয়েছে কিনা। যদি দেওয়া থাকে, তাহলে মেয়ে নিজের উপর নিজেই তালাক কার্যকর করবে। অতঃপর ইদ্দত পালনের পর অন্যত্র বিবাহ বসবে। আর যদি তালাকের অধিকার দেওয়া না থাকে, তাহলে নিজ সমস্যার কথা উল্লেখ করে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে কোন মুসলিম বিচারকের নিকট মামলা দায়ের করবে। যদি এরকম বিচারক না পাওয়া যায়, তাহলে মুসলিম পঞ্চায়েতে বা উলামায়ে কিরামের নিকট সমস্যা পেশ করবে এবং তাদের নিকট বিবাহ বন্ধন ও স্বামী নিখোঁজের সাক্ষী প্রমাণ পেশ করবে। অতঃপর তারা স্বামীর তল্লাশি নিবে। তল্লাশির পর যখন প্রমাণিত হবে প্রকৃত অর্থেই তার স্বামী নিখোঁজ । বিচারক বা উলামায়ে কিরাম নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রীকে চার বছর অপেক্ষা করার জন্য আদেশ দিবে। চার বছর পূর্ণ হলে এবং এর মধ্যে স্বামী ফিরে না আসলে উক্ত স্ত্রী বিচারক বা উলামায়ে কিরামের দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা করাবে। তারা যদি তার স্বামীকে মৃত সাব্যস্ত করে বিবাহ বিচ্ছেদের রায় প্রদান করেন, তাহলে উক্ত স্ত্রীকে মৃত স্বামীর ইদ্দত (চার মাস দশদিন) সময় ইদ্দত পালনের পর এ মহিলা অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে। আর জীবিত সাব্যস্ত করে বিচ্ছেদের ফায়সালা দিয়ে থাকলে উক্ত স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা মেয়ের ইদ্দত- তিন ঋতুস্রাব পালনের পর অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবেন।

আর উক্ত স্ত্রীর জন্য যদি চার বছর অপেক্ষা করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর না হয়; যেমন তার খোরপোষের ব্যবস্থা না থাকা, বা অন্যত্র বিবাহ না হলে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকা। তাহলে বিচারক বা উলামায়ে কিরাম স্ত্রীকে চার বছরের পরিবর্তে এক বছর অপেক্ষা করার নির্দেশ দিবে । অতঃপর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামী ফিরে না আসলে উক্ত স্ত্রী বিচারক বা উলামায়ে কিরাম দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা করাবে। আদালত কিংবা উলামায়ে কিরাম তাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী স্বামীকে মৃত কিংবা জীবিত যে কোনটি সাব্যস্ত করে স্ত্রীর বিচ্ছেদের ফায়সালা দেওয়ার পর স্ত্রীকে সে অনুযায়ী ইদ্দত পালনপূর্বক অন্য স্বামীর সহিত বিবাহ বসার ইখতিয়ার থাকবে।

পরবর্তীতে প্রথম স্বামী ফিরে আসলে উক্ত ২য় বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। স্ত্রী প্রথম স্বামীর স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবেন। তবে উক্ত স্ত্রীকে তালাকের ইদ্দত হিসেবে তিন মাস দশ দিন অপেক্ষার পর প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে হবে।

এ সম্পর্কে মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ কিতাবে এসেছে-

عن ابن عيينة، عن عمرو، عن يحيى بن جعدة، أن رجلا استهوته الجن على عهد عمر، فأتت امرأته عمر، فأمرها "أن تربص أربع سنين، ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها، ثم أمرها أن تعتد، فإذا انقضت عدتها تزوجت، فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق."

(মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২২; كتاب النكاح، باب ومن (قال: تعتد وتزوج ولا تربص

আল মাবসূত কিতাবে লিখেছেন-

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أنا لقيت المفقود فحدَّثني حديثَه قال: أكلتُ حريرًا في أهلي ثم خرجتُ، فأخذني نفَر مِن الجنّ، فمكثتُ فيهم ثم بدا لهم في عِتقي فأعتقوني، ثم أتوا بي قريبًا مِن المدينة، فقالوا: أتعرِف النَّخيل، فقلت: نعَم. فخلَّوا عنّي فجئتُ، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أبان امرأتي بعد أربعِ سنين، وحاضَت وانقضَت عدتُّها وتزوّجَتْ

উক্ত কিতাবে আরো লিখেছেন-

وأما تخييره إياه بين أن يردها عليه وبين المهر فهو بناء على مذهب عمر رضي الله عنه في المرأة إذا نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت ثم أتى الزوج الأول حياً أنه يخير بين أن ترد عليه وبين المهر، وقد صح رجوعه عنه إلى قول علي رضي الله عنه، فإنه كان يقول: ترد إلى زوجها الأول، ويفرق بينها وبين الآخر، ولها المهر بما استحل من فرجها، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها من الآخر، وبهذا كان يأخذ إبراهيم رحمه الله فيقول: قول علي رضي الله عنه أحب إلي من قول عمر رضي الله عنه، وبه نأخذ أيضاً؛ لأنه تبين أنها تزوجت وهي منكوحة، ومنكوحة الغير ليست من المحللات، بل هي من المحرمات في حق سائر الناس

(আল মাবসূত, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৩৭; (كتاب المفقود
রদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন-

وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي قَرِيبًا فِي الْمُسَخَّرِ، وَكَذَا مَا فِي الْفَتْحِ مِنْ بَابِ الْمَفْقُودِ لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ إلَّا إذَا رَأَى الْقَاضِي مَصْلَحَةً فِي الْحُكْمِ لَهُ وَعَلَيْهِ فَحَكَمَ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ اهـ

(রদ্দুল মুহতার, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৪)

আব্দুল্লাহ খালেদ
রাধানগর, ছাগলনাইয়া

প্রশ্ন: মসজিদের দানবাক্সের টাকা দিয়ে ত্রাণ দেওয়া যাবে কী না?

জবাব: না, যাবে না। কেননা মসজিদের দানবাক্সে যারা দান করেছেন, তাদের দানের উদ্দেশ্য মসজিদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তা ব্যয় হবে। আর ত্রাণ দেওয়ার বিষয়টি এর সংশ্লিষ্ট কিছু নয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে মসজিদের দানবাক্সের টাকা ব্যয় করা জায়িয নয়। এ সম্পর্কে রদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন-

انَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مُرَاعَاةَ غَرَضِ الْوَاقِفِينَ وَاجِبَةٌ

-ফকীহগণ স্পষ্টভাবে বিবৃতি দিয়েছেন যে, দাতাদের উদ্দেশ্য বিবেচনায় নেওয়া বাধ্যতামূলক। (রদ্দুল মুহতার, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৫)

উক্ত কিতাবে আরো এসেছে-

شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ أَيْ فِي الْمَفْهُومِ وَالدَّلَالَةِ

-ওয়াকফের দাতার শর্ত শরীআত প্রণেতার ভাষ্যের মত (অপরিহার্যভাবে গৃহীত)। (রদ্দুল মুহতার, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৬)

ফয়ছল আহমদ
মোগলাবাজার, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

প্রশ্ন-১: আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি নিয়ম হচ্ছে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের দিনে যতক্ষণ চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত গর্ভবতী মহিলাদের কোন কিছু খাওয়া, কোন কিছু কাঁটা, ঘুমানো এমনকি নামায পড়া থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়। এ বিষয়ে হাদীসের আলোকে জানালে উপকৃত হবো।

জবাব: চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হলো আল্লাহ তাআলার কুদরতের দুটি নিদর্শন। এগুলো নিয়ে আমাদের সমাজে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে । প্রশ্নোল্লিখিত বিষয়টিও সামাজিক কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত, যা বর্জনীয়।

চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণের সময় করণীয় হলো দুই রাকআত নফল নামায আদায় করা, কৃত গুনাহের জন্য তাওবাহ, ইস্তিগফার করা। আল্লাহর তাকবীর, তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে এ সময় পার করা।

আম্মাজান হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا، وَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

-সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর (কুদরত প্রকাশের) বিশেষ নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। সুতরাং যখন তোমরা সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ দেখতে পাও, তখন তাকবীর দাও, আল্লাহর নিকট দুআ করো, নামায আদায় করো এবং সাদকা করো। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-৯০১)

প্রশ্ন-২: মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর কবরের উপর পানি ঢেলে দেওয়ার কি কোন নিয়ম আছে বা এরকম করার ক্ষেত্রে হাদীসে কী বলা হয়েছে? এরকম করলে কি গোনাহ হবে?

জবাব: কেউ যদি এমন বিশ্বাস রাখেন যে, কবরের উপর পানি দিলে সে পানি মৃত ব্যক্তির উপকার করবে তাহলে তা বর্জনীয়। এমন ধারণা বা বিশ্বাস রাখা জায়িয নেই। কারণ, কবরের উপরের পানি মৃতদের কোন কাজে আসবে না। এমন ধারণা বা বিশ্বাস না রেখে স্বাভাবিকভাবে পানি দিতে কোন অসুবিধা নেই। উলামায়ে কিরামের অনেকেই দাফনের পর কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেওয়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। যাতে কবরের মাটিগুলো জমে থাকে।

ولا بأس برش الماء على القبر ; لأنه تسوية له (بدائع الصنائع. ٢/٨٥٣)

ويستحب أن يرش على القبر ماء ليلتزق ترابه (المغني٢/٢٩١)

বদরুল ইসলাম
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

প্রশ্ন: অন্য মাযহাবের ইমামের পিছনে রামাদানে বিতর নামায জামাআতে পড়ার ক্ষেত্রে কি ইমামের ইকতিদা করে রুকুর পরে দুআয়ে কুনূত পড়া যাবে? নাকি এক্ষেত্রে ইকতিদা না করে রুকুর আগে দুআয়ে কুনূত পড়তে হবে? জানতে চাই।

জবাব: বিতর নামাযের কুনূত পড়ার ক্ষেত্রে অন্য মাযহাবের ইমামের ইকতিদায় (রামাদানে জামাআতে) পড়লে রুকুর পরে কুনূত পড়া যাবে। এ সম্পর্কে 'আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ' কিতাবে লিখেছেন:

وَلَوْ صَلَّى الْوِتْرَ بِمَنْ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي الْقَوْمَةِ وَالْمُقْتَدِي لَا يَرَى ذَلِكَ تَابَعَهُ فِيهِ. هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

-যদি কেউ এমন ইমামের ইকতিদায় বিতর নামায আদায় করে, যিনি রুকুর পরে কাওমাহতে কুনূত পড়েন, অথচ মুক্তাদী নিজে এমনটা করাকে সমীচীন মনে করে না, এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি কুনূতের বিষয়ে ইমামের অনুসরণ করবে। ফাতাওয়া কাযীখানে অনুরূপ রয়েছে। (আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১)

আলমাছ খান
জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ

প্রশ্ন: আমি বিতর নামাযে তৃতীয় রাকাআতে দাঁড়ানো থাকাবস্থায় দুআয়ে কুনূত পড়তে ভুলে গিয়েছি। অতঃপর রুকুতে যাওয়ার পর স্মরণ হয়েছে, এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

জবাব: এমতাবস্থায় রুকুতে কুনূত পড়ার প্রয়োজন নেই এবং রুকু থেকে ফিরে এসে দাঁড়িয়েও কুনূত পড়ার প্রয়োজন নেই। যথানিয়মে অবশিষ্ট নামায পড়ে সাহু সিজদা করলে নামায হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে 'আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ' কিতাবে আছে,

وَلَوْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فَتَذَكَّرَ فِي الرُّكُوعِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقْنُتُ فِي الرُّكُوعِ وَلَا يَعُودُ إلَى الْقِيَامِ. هَكَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة

-যদি কেউ কুনূত পড়তে ভুলে যায়, অতঃপর রুকুতে স্মরণ হয় তাহলে বিশুদ্ধ অভিমত অনুসারে সে রুকুতে কুনূত পড়বে না এবং কুনূতের জন্য ফিরে দাঁড়াবে না। তাতারখানিয়াহ কিতাবে এরূপ রয়েছে। (আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১)

এ সম্পর্কে 'তুহফাতুল ফুকাহা' কিতাবে লিখেছেন-

إذا نسي الْقُنُوت حَتَّى ركع ثمَّ تذكر فِي الرُّكُوع فَإِنَّهُ يمْضِي على رُكُوعه وَلَا يعود إِلَى الْقيام ليقنت

-যখন কেউ কুনূত পড়তে ভুলে যায় এবং রুকুতে যাওয়ার পর স্মরণে আসে, সে যথানিয়মে রুকু করে যাবে এবং কুনূতের জন্য পুনরায় কিয়ামে ফিরবে না। (তুহফাতুল ফুকাহা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৫)

এ বিষয়ে রদ্দুল মুহতার কিতাবে এসেছে:

لَوْ تَذَكَّرَ الْقُنُوتَ فِي الرُّكُوعِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَعُودُ، وَلَوْ عَادَ وَقَنَتَ لَا يَرْتَفِضُ رُكُوعُهُ وَعَلَيْهِ السَّهْوُ لِأَنَّ الْقُنُوتَ إذَا أُعِيدَ يَقَعُ وَاجِبًا لَا فَرْضًا كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ

(রদ্দুল মুহতার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১)

অনুরূপ হাশিয়াতুত তাহতাবী কিতাবে লিখেছেন:

لو تذكر القنوت في الركوع فإنه لا يعود ولا يقنت فيه لفوات محله ولو عاد وقنت لم يرتفض ركوعه لأن القنوت لا يقع فرضا فلا يرتفض به الفرض ويسجد للسهو على كل حال ليترك الواجب أو تأخيره

-কেউ কুনূত ভুলে গিয়ে রুকুতে স্মরণ হলে যথাযথ স্থান ছুটে যাওয়াতে সে কিয়ামে ফিরে আসবে না এবং রুকুতে কুনূত পড়বে না। যদি কিয়ামে ফিরে এসে কুনূত করে তাহলে তার রুকু নষ্ট হবে না, কেননা কুনূত ফরয নয় যা দ্বারা অন্য ফরয নষ্ট হওয়া অপরিহার্য হয়। তবে সে সর্বাবস্থায় সাহু সিজদাহ করবে- ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া কিংবা বিলম্বে আদায় করার কারণে। (হাশিয়াতুত তাহতাবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬১)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন: মাথার চুল পড়ে গেলে এবং মাথার কিছু অংশ টাক হয়ে চুল গজায় না এমন হলে, নিজের চুল কৃত্রিম পদ্ধতিতে সেখানে লাগানো যাবে কি? উযূ ও গোসলে উক্ত চুল ধৌত করা কিংবা মাসেহ করার বিধান কী?

জবাব: মাথায় কৃত্রিম চুল লাগানোর হুকুম হলো, এই চুল অন্য মানুষের হলে তা লাগানো নাজায়িয। উক্ত চুল যদি মানুষ কিংবা শুকরের না হয়ে থাকে এবং তা দ্বারা অন্যকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়ে থাকে,

তাহলে এর ব্যবহার জায়িয রয়েছে। তবে তা অনুত্তম। (মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৫৭৪৩)

তবে কৃত্রিম পরচুলা লাগানোর উদ্দেশ্য যদি কাউকে ধোঁকা দেওয়া হয়, তাহলে এর ব্যবহার নাজায়িয ও অনুচিত। কেননা যারা কৃত্রিম চুল লাগায় তাদেরকে হাদীসে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। সুনানু আবী দাউদ, ইবন মাজাহ, ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হাদীস শরীফে এসেছে-

عن عبدِ الله، قال: لعَنَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم الواصِلَةَ والمُستوصِلةَ، والوَاشِمَةَ والمُستَوشِمَةَ

-হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন ঐসব নারীদেরকে যারা পরচুলা তৈরী করে, যারা তা ব্যবহার করে, যারা দেহে উল্কি লাগিয়ে দেয় এবং যারা উল্কি লাগায়। (সুনানু আবী দাউদ, হাদীস-৪১৬৮)

মাথার কৃত্রিম চুল যদি এমনভাবে আটকে রাখা হয় যে তা শরীরের অংশ হয়ে যায় এবং আসল মাথায় পানি পৌঁছাতে না পারে তাহলে উক্ত চুলের বিধান উযূ কিংবা গোসলের ক্ষেত্রে আসল চুলের ন্যায়। অর্থাৎ ফরয গোসলের ক্ষেত্রে মাথা ধৌত করা এবং উযূর ক্ষেত্রে মাথা মাসেহ করা। অনুরূপ যদি কোনো ব্যক্তির নিজের চুল এক স্থান থেকে সরিয়ে একই ব্যক্তির মাথায় অন্য স্থানে এমনভাবে প্রতিস্থাপন করা হয় যে, সেই লোমগুলো প্রকৃত চুলের মতো দেহের অঙ্গ হয়ে যায় এবং স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে এর বিধান আসল চুলের ন্যায় হবে।

আর যদি সহজে আলাদা করা যায়, তবে কৃত্রিম চুল সরিয়ে মাথার মূল অংশ ফরয গোসলের ক্ষেত্রে ধৌত করা এবং উযূর ক্ষেত্রে মাসেহ করা অপরিহার্য। উক্ত বিষয়ের সমাধানে রদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন-

أَقُولُ: فِيهِ أَنَّ الْغُسْلَ فِي الِاصْطِلَاحِ غَسْلُ الْبَدَنِ، وَاسْمُ الْبَدَنِ يَقَعُ عَلَى الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ إلَّا مَا يَتَعَذَّرُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ أَوْ يَتَعَسَّرُ كَمَا فِي الْبَحْرِ، فَصَارَ كُلٌّ مِنْ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ جُزْءًا مِنْ مَفْهُومِهِ فَلَا تُوجَدُ حَقِيقَةُ الْغُسْلِ الشَّرْعِيَّةِ بِدُونِهِمَا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي الْبَدَائِعِ ذَكَرَ رُكْنَ الْغُسْلِ وَهُوَ إسَالَةُ الْمَاءِ عَلَى جَمِيعِ مَا يُمْكِنُ إسَالَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ

(রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫১)

উক্ত কিতাবে আরো লিখেছেন-

قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَهَا أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّزْوِيرِ كَمَا يَظْهَرُ مِمَّا يَأْتِي وَفِي شَعْرِ غَيْرِهَا انْتِفَاعٌ بِجُزْءِ الْآدَمِيِّ أَيْضًا: لَكِنْ فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَإِذَا وَصَلَتْ الْمَرْأَةُ شَعْرَ غَيْرِهَا بِشَعْرِهَا فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَإِنَّمَا الرُّخْصَةُ فِي غَيْرِ شَعْرِ بَنِي آدَمَ تَتَّخِذُهُ الْمَرْأَةُ لِتَزِيدَ فِي قُرُونِهَا، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَفِي الْخَانِيَّةِ وَلَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ فِي قُرُونِهَا وَذَوَائِبِهَا شَيْئًا مِنْ الْوَبَرِ (قَوْلُهُ «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ» إلَخْ) الْوَاصِلَةُ: الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ الْغَيْرِ وَالَّتِي يُوصَلُ شَعْرُهَا بِشَعْرٍ آخَرَ زُورًا وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: الَّتِي يُوصَلُ لَهَا ذَلِكَ بِطَلَبِهَا وَالْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَشِمُ فِي الْوَجْهِ وَالذِّرَاعِ، وَهُوَ أَنْ تَغْرِزَ الْجِلْدَ بِإِبْرَةٍ ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ أَوْ نِيلٍ فَيَزْرَقُّ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ بِطَلَبِهَا وَالْوَاشِرَةُ: الَّتِي تُفْلِجُ أَسْنَانَهَا أَيْ تُحَدِّدُهَا وَتُرَقِّقُ أَطْرَافَهَا تَفْعَلُهُ الْعَجُوزُ تَتَشَبَّهُ بِالشَّوَابِّ وَالْمُسْتَوْشِرَةُ: الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا بِأَمْرِهَا اهـ الْخِيَارُ، وَمِثْلُهُ فِي نِهَايَةِ ابْنِ الْأَثِيرِ وَزَادَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا– أَنَّهَا قَالَتْ: لَيْسَ الْوَاصِلَةُ بِالَّتِي تَعْنُونَ. وَلَا بَأْسَ أَنْ تَعْرَى الْمَرْأَةُ عَنْ الشَّعْرِ، فَتَصِلَ قَرْنًا مِنْ قُرُونِهَا بِصُوفٍ أَسْوَدَ وَإِنَّمَا الْوَاصِلَةُ الَّتِي تَكُونُ بَغِيًّا فِي شَبِيهَتِهَا فَإِذَا أَسَنَّتْ وَصَلَتْهَا بِالْقِيَادَةِ وَالْوَاشِرَةُ كَأَنَّهُ مِنْ وَشَرَتْ الْخَشَبَةَ بِالْمِيشَارِ غَيْرِ مَهْمُوزٍ اهـ

(রদ্দুল মুহতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৩)

সাদিক চৌধুরী
মিশিগান, ইউ.এস.এ

প্রশ্ন: ডায়ালাইসিস চলাকালীন সময়ে নামাযের সময় চলে যাওয়ার উপক্রম হলে তায়াম্মুম করে ইশারায় নামায পড়া যাবে কী? এমতাবস্থায় করণীয় কি? জানতে চাই।

জবাব: ডায়ালাইসিস চলাকালীন সময়ে রোগীর শরীর থেকে যান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রক্ত বের করে আবার পরিশোধন করে সে রক্ত শরীরে প্রবেশ করানো হয়। এতে উযূ বিনষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং এমতাবস্থায় আগে উযূ করে থাকলেও উযূ নষ্ট হবে। তদ্রুপ কেউ এরূপ অবস্থায় তায়াম্মুম করলে সে পবিত্র হবে না। কেননা উযূ নষ্ট হওয়ার সকল কারণ তায়াম্মুম নষ্ট হওয়ার কারণ বটে। তাই এমতাবস্থায় পবিত্রতা ব্যতীত নামায আদায়ের প্রশ্নই আসে না। কেউ পড়ে নিলেও তা শুদ্ধ কিংবা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা থাকলে বা ওয়াক্ত চলে গেলেও ডায়েলসিস শেষ হওয়ার পর সে নামায যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে কাযা করাই বাঞ্চনীয়। এ সম্পর্কে আল ফাতাওয়াল হিন্দীয়্যাহ কিতাবে লিখেছেন-

(وَمِنْهَا) مَا يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ وَيَسِيلُ إلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ الدَّمِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ وَالْمَاءِ لِعِلَّةٍ وَحَدُّ السَّيَلَانِ أَنْ يَعْلُوَ فَيَنْحَدِرَ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ. كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ .

(আল ফাতাওয়াল হিন্দীয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০)

উক্ত কিতাবে আরো লিখেছেন,

وَإِذَا خَافَ الْمُحْدِثُ إنْ تَوَضَّأَ أَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ أَوْ يُمْرِضَهُ يَتَيَمَّمُ. هَكَذَا فِي الْكَافِي وَاخْتَارَهُ فِي الْأَسْرَارِ

(আল ফাতাওয়াল হিন্দীয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮)

আল মুহীতুল বুরহানী কিতাবে লিখেছেন-

ومن جملة ذلك الوقت حتى لو صلى قبل دخول الوقت لا يجوز، وقد ذكرنا مواقيت الصلاة في الفصل المتقدم .

(আল মুহীতুল বুরহানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৪)

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগে

"ঈমান, আমাল ও আকীদা বিষয়ক আপনার যেকোনো প্রশ্ন আজই পরওয়ানার অনুকূলে পাঠিয়ে দিন।???

প্রশ্ন করার নিয়ম
- শুধুমাত্র প্রশ্নের মূল কথাগুলো লিখে পাঠাতে হবে
- ই-মেইল অথবা ডাকযোগে প্রশ্ন পাঠাতে পারবেন

প্রশ্ন করুন

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা
অফিস: ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা, ৩৩৪/৪এ, দক্ষিণ গোড়ান, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
সিলেট বিভাগীয় অফিস: পরওয়ানা ভবন-৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট
E-mail: parwanabd@gmail.com

অভ্যন্তরীণ

বাংলাদেশে গতমাস শুরু হয় পূর্ববর্তী মাস তথা জুলাইয়ের ধারাবাহিকতায়। আরো সহজ করে বললে, আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা ৩১ এর পরে ৩২ জুলাই থেকে গণনা শুরু করেন এবং ৫ ই আগস্ট ৩৬ জুলাই আখ্যায়িত করে শেখ হাসিনার ভারতে পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এই গণনা সমাপ্ত করেন। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধি পাওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনটির অন্যতম সমন্বয়ক মো. নাহিদ ইসলাম ৩ আগস্ট বলেন, *"আমরা এখনও আগস্টে যাইনি। এই জুলাই হত্যার বিচার করেই আমরা আগস্টে যাব।"* ফলে আন্দোলনটি আগস্টে সমাপ্ত হলেও "বাংলার জুলাই বিপ্লব" বলে খ্যাতি পায়। জুলাইয়ের শুরুতে **উচ্চ আদালতের রায়কে কেন্দ্র করে কোটা সংস্কারে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নেমেছিল শিক্ষার্থীরা। আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও ছাত্র সংগঠন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বলপ্রয়োগে সেই আন্দোলন এক পর্যায়ে রূপ নেয় সরকার পতনের আন্দোলনে। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সেই আন্দোলনকে দমাতে ছাত্র-জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। প্রাণ হারায় শিক্ষার্থীসহ বিপুল সংখ্যক মানুষ। কিন্তু তারপরও দমানো যায়নি ছাত্র-জনতাকে। ঘটনার ধারাবাহিকতায় ৪ আগস্ট** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে ডাক আসে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই কর্মসূচি ঠেকাতে রাতেই জারি হয় কারফিউ। মোতায়েন করা হয় সেনাবাহিনী। ৫ আগস্ট সেই কারফিউ ভেঙ্গে রাজধানীর অলিগলিতে অবস্থান নেন ছাত্র-জনতা। তাদেরকে মূল সড়কে উঠতে বাধা দেয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। বেলা দুইটার সময় গণমাধ্যমে খবর বের হয় পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে ঢাকার রাজপথসহ সারাদেশে নেমে পড়েন লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা। তারা একে অপরকে ঘিরে ধরে বিজয় উল্লাস করতে থাকেন। নানা স্লোগানে প্রকম্পিত হয় রাজপথ। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জড়ো হন শাহবাগে। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনের দিকে যাত্রা করে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা। গণভবনের পাশাপাশি জাতীয় সংসদ ভবনেও অবস্থান নেন তারা।

পাঁচই অগাস্টের ওই ঘটনার তিনদিন পর শপথ গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। নতুন এই সরকারের হাতে গত এক মাসে প্রশাসনের শীর্ষপদে ব্যাপক রদবদলের ঘটনা ঘটেছে, যা এখনও চলমান আছে। সেইসঙ্গে, দেশের আর্থিকখাতসহ বেশকিছু ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে সংস্কার উদ্যোগ।

স্থানীয় জনপ্রতিধিদের অপসারণ করে তাদের জায়গায় বসানো হয়েছে প্রশাসক। ব্যাংকখাত সংস্কারে সিদ্ধান্ত হয়েছে আলাদা কমিশন গঠনের । সেই সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, অনিয়ম-জালিয়াতির ঋণ ও পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনার। দীর্ঘ ১৬ বছর ক্ষমতায় থাকা পতিত সরকারের নেতা কর্মীদের বাড়ি-ঘর জালাও পোড়াও সহ কিছুটা নৈরাজ্যও এই সময়ে সংগঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ যখন পরিবর্তিত পরিস্থিতি সামালে ব্যস্ত তখনই কোন পূর্ব ঘোষণা না দিয়েই ভারত ত্রিপুরার ডম্বুর হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার প্রজেক্ট বা ডম্বুর গেট খুলে দেয়। ত্রিপুরা রাজ্যের গোমতীর জেলা প্রশাসক তরিৎ কান্তি চাকমা তার সরকারি এক্স একাউন্টে (সাবেক টুইটার) বাধ খোলে দেওয়ার তথ্য জানান। আকস্মিক ভারতের ডম্বুর বাধ খোলে দেওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি তীব্র আকার ধারণ করে বাংলাদেশের ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও লক্ষিপুর অঞ্চলে। সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা দাড়িয়েছিলো ফেনীর ফুলগাজী, পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া উপজেলায়। প্রবল স্রোতে বৃদ্ধ, শিশু সহ অনেক মানুষ ভেসে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে, বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, ফসলি জমি। এমন পরিস্থিতিতে এসব এলাকা পুরোপুরি বিদ্যুতহীন হয়ে পড়ে, বন্ধ হয়ে যায় মোবাইল নেটওয়ার্কও। বন্যার পানির গভীরতা, তীব্র স্রোত ও নৌযানের অপ্রতুলতায় প্রাথমিকভাবে উদ্ধার তৎপরতায় বেগ পেতে হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর যৌথ তৎপরতা ও স্বেচ্ছাসেবীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আটকে পড়া মানুষজনকে উদ্ধার করা হয়। এই আকস্মিক বন্যায় পূর্বাঞ্চলের জীবন যাত্রায় যে ধাক্কা লাগে তা কাঠিয়ে উঠতে অনেকদিন লেগে যাবে বলে মানুষ মনে করছেন। নেটিজেনেরা ভারতের পানি আগ্রাসনের প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছেন। তারা সরকারকে আন্তর্জাতিক আদালতের শরণাপন্ন হওয়ারও পরামর্শ দিচ্ছেন।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় সরকারি বাহিনীগুলোর পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থাগুলো নিরলস কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় ব্যাপক ভূমিকা রেখে প্রশংসিত হয়েছে আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী প্রতিষ্ঠিত দাতব্য সংস্থা লতিফি হ্যাণ্ডসসহ আরো কিছু সংস্থা।

আন্তর্জাতিক

জুলাইয়ের শেষ দিনে শাহাদতবরণকারী হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া ছিলেন পুরো আগস্ট মাসজুড়ে মধ্যপ্রাচ্য তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। আগস্টের প্রথম দিনে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার ইমামতীতে তার প্রথম জানাযা এবং ২ আগস্ট কাতারের রাজধানী দোহায় দেশটির আমীরের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় জানাযা শেষে সমাহিত করা হয় দোহাতেই। এই প্রেক্ষিতে দুটি বিষয়ে ছিল সকলের নযর— এক. তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন কে, আর দুই. ইরান এবং হামাসের প্রতিক্রিয়া কী হতে যাচ্ছে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর কিছুদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায়, হামাস তথা ফিলিস্তিনের অন্যতম প্রধান নেতা ইয়াহইয়া সিনওয়ার ইসমাইল হানিয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন হামাসের সকলের সম্মতিতে। হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান হিসেবে তার প্রতি সামরিক শাখা আল কাসসাম ব্রিগেডও সর্বোচ্চ আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। গত অক্টোবর থেকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় আতঙ্ক সিনওয়ার এখন

হামাসের সর্বোচ্চ নেতা। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে হামাস তাদের শক্ত অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট বার্তা দিলো— তারা কোনভাবেই নতি শিকার করতে যাচ্ছে না, বরং এই যুদ্ধে সিনওয়ারের নেতৃত্বকে আরো শক্তিশালী করা হলো। হানিয়ার শাহাদতের পরপর অনেক বিশ্লেষক বলছিলেন, ইসরায়েল ফিলিস্তিনী কোন নেতাকে শহীদ করলে সাধারণত তাদের সামনে তার চেয়েও শক্তিশালী কোন নেতার আবির্ভাব ঘটে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ইরান এবং হামাসের পক্ষ থেকে বারবার জানান দেওয়া হচ্ছে— যথাসময়ে যথাযথ প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। তবে ইসরায়েলের সাথে ফিলিস্তিনী প্রতিরোধযোদ্ধা এবং লেবাননের হিযবুল্লাহসহ অন্যদের যুদ্ধ চলমান থাকলেও হানিয়া হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে প্রত্যাশিত বড় ধরনের কোন আক্রমণ এখনও হয়নি বলা চলে। ইরানের রাজধানীতে হানিয়ার শাহাদতের ফলে তাদের তরফ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের এক ধরনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে সন্দেহ নেই, ইসরায়েলও সেই জবাবী হামলার অপেক্ষায় আছে, সেই হামলায় বিলম্ব মূলত ইসরায়েলের কপালের ভাজ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্লেষকদের ধারণা কৌশলগত চাপ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইরান এবং হামাস তাৎক্ষণিক বড় হামলা না করে কিছুটা সময় নিচ্ছে সম্ভবত। তবে কাছাকাছি সময় নিহত হিযবুল্লাহ নেতা ফুয়াদ শুকুর এর গুপ্তহত্যার প্রতিশোধ হিসেবে হিযবুল্লাহ এর আক্রমণের প্রথম ধাপ আগস্ট মাসেই শুরু হয়, এর প্রেক্ষিতে ইসরায়েলে জরুরি অবস্থাও জারি করা হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে গত ১২ আগস্ট মধ্যপ্রাচ্যে গাইডেড মিসাইল সাবমেরিন পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বলে বিবিসির সূত্রে জানা যায়। ইসরায়েলের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে অন্ধ অবস্থান এর মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসন আরো স্পষ্ট করতে চাচ্ছে বলে ধারণা বিশ্লেষকদের। অবশ্য এসবের মধ্যেও যুদ্ধবিরতির আলোচনা থেমে নেই, কিন্তু ইসরায়েলের গোয়ার্তুমির কারণে কোন শান্তি প্রস্তাবই শেষ পর্যন্ত সফল হচ্ছে না। আগস্ট মাসে কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত সংলাপও তাই শেষ পর্যন্ত অসফলই থেকে গেছে।

গত আগস্ট মাসে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে বাংলাদেশেই, ৫ই আগস্ট স্বৈরতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে। এটি আপাত দৃষ্টিতে জাতীয় ঘটনা হলেও এর আন্তর্জাতিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। তবে এই অভ্যুত্থান সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে ভারত এবং পাকিস্তানে।

পাকিস্তানে ৫ই আগস্টের পরপর ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে তার দলের ছাত্র সংগঠন মাঠে নেমেছে, এবং কোন রাখঢাক ছাড়াই তার এই আন্দোলনের পিছনে বাংলাদেশের অনুপ্রেরণার কথা উল্লেখ করছে। পাকিস্তানের রাস্তায় বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে চলছে তুমুল আন্দোলন— এমন দৃশ্য সত্যিই অভিনব। তবে বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনের বৈসাদৃশ্য অনেক, তাই শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যাচ্ছে পাকিস্তানের আন্দোলন, তা বলা মুশকিল। অপরদিকে যে ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে এই আন্দোলন, তিনি নিজের আবার আলোচনা সৃষ্টি করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সিদ্ধান্তের কারণে। জেলে বসেই তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সাবেক অক্সফোর্ড শিক্ষার্থী ইমরান খান তার আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে ভারতে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের প্রভাব পড়েছে কিছুটা ভিন্নরূপে। কলকাতায় চিকিৎসক ধর্ষণকাণ্ডের প্রতিবাদে চলমান আন্দোলনে বাংলাদেশের আন্দোলন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তবে এর বাইরেও ঘটে চলছে অনেক ঘটনা। বাংলাদেশের স্বৈরশাসক ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর এবং বাংলাদেশে ভারতের তাবেদার সরকারের অনুপস্থিতিতে এ অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারত বহুদিন পর অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে। তার প্রভাব আঁচ করা যায় দেশটির গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করলে। নিজেদের ভূরাজনৈতিক নিরাপত্তা ও কৌশলগত সুবিধাজনক অবস্থান নিশ্চিত, বাংলাদেশের সাথে ভারতের বদলে সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর চীনের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি আর দিল্লিতে পুরনো বিশ্বস্থ মিত্র হাসিনাকে আশ্রয় দান— সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে ভারত রীতিমতো কঠিন অবস্থায় পড়েছে।

গত জুলাই মাসের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন জো বাইডেন, তার জায়গায় নাম এসেছিল কমলা হ্যারিসের। আগস্টজুড়ে ট্রাম্প বনাম কমলা হ্যারিস বিতর্ক অব্যাহত ছিল। ট্রাম্পের সাথে বিতর্কে জো বাইডেনের খারাপ ফলাফলের পর কমলা হ্যারিসকে নিয়ে ডেমোক্রেটদের মধ্যে আশার জোয়ার এসেছে বলা চলে— আগামী ১০ সেপ্টেম্বর এবিসি নিউজের আয়োজনে ট্রাম্প আর হ্যারিস মুখোমুখি হবেন বলে জানা যাচ্ছে। ডেমোক্রেটদের ধারণা কমলা হ্যারিস এবার তাদের মুখরক্ষা করতে পারবেন। তবে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিসতে কমলা হ্যারিসকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেই যাচ্ছেন রিপাব্লিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। কমলা হ্যারিসের বুদ্ধির প্রতি তার খুব বেশি শ্রদ্ধা নেই, কমলা সমাজতান্ত্রিক পাগল, তিনি কমলার চেয়ে বেশি সুন্দর ইত্যাদি নানা ব্যক্তিগত আক্রমণের জবাবে কমলা হ্যারিস অবশ্য নাম উল্লেখ না করে ট্রাম্পকে ইঙ্গিত করে 'কাপুরুষ' আখ্যা দিয়েছেন। মার্কিন রাজনীতির খোঁজ-খবর রাখেন এমন সকলের এখন নজর ১০ সেপ্টেম্বরের প্রেসিডেনশিয়াল ডিবেটের দিকে।

এদিকে আফগানিস্তানে তালেবান শাসন শুরুর তিন বছর পর সংযুক্ত আরব আমিরাত তালেবান কর্তৃক নিযুক্ত কুটনীতিবিদ মৌলভী বদরুদ্দীন হক্কানীকে আমিরাতে আফগান রাষ্ট্রদূত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে বলে জানা যায়। চীনের পর এই প্রথম কোন দেশ আফগানিস্তানের তালেবানের সাথে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু করলো। জানা গেছে, আবুধাবিতে আফগানিস্তানের দূতাবাস এবং দুবাইয়ের আফগান কনস্যুলেট অন্তত গতবছর থেকে তালেবান কূটনীতিকরা কাজ করছে। তবে এতোদিন আফগান কুটনীতিক হিসাবে তাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছিল না। দেরিতে হলেও রাষ্ট্রদূত গ্রহণের মধ্য দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের একরকম স্বীকৃতিই পেল তালেবান সরকার। সংযুক্ত আরব আমিরাত পশ্চিমা ঘেষা আরব দেশ হিসেবে বহুল পরিচিত, ফলে সেখানে তালেবানের রাষ্ট্রদূতের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি কূটনৈতিক দুনিয়ায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।



কবিতা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরহে

হযরত আলী ইবন আবী তালিব (রা.)

কাব্যানুবাদঃ আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

শোকাতুর এক লোকের কান্না শুনে রাতে ঘুম ভাঙে হঠাৎ
তার 'আল্লাহু আকবার' ডাক শুনে জেগে থাকি সারাটি রাত।

জিজ্ঞাসা করি তাকে, যখন সে কাঁদতে কাঁদতে এদিকে এলো
প্রিয়নবী ছাড়া অন্য কারোর শোকে মনে হয় কান্না পেলো?

না, আশংকা যা করেছি, সেটাই সত্য হলো; সে নির্বিকার!
আমার সুহৃদ, শোভা ও সহায় নবীর শোকেই কান্না তার।

খোদার কসম! নবী, আপনাকে আমি তো কখনো যাবো না ভুলে
এ উপত্যকা ধরে যতদিন উট যাবে, পিঠে আমাকে তুলে।

আহা, যতবার কোনো টিলা থেকে পড়ে গেছি আমি হোঁচট খেয়ে
আমার আছাড় খাওয়ার চিহ্ন মুছে গেছে তাঁর মমতা পেয়ে।

তিনি বীর, তেজী ঘোড়াও ভেঙ্গে পড়তো নবীর সামনে যেয়ে
যেনবা তাদের সামনে একটা সিংহ সরোষে আসছে ধেয়ে।

কতেক সিংহ ডেরাতে বসেই হুংকার ছাড়ে ক্ষিপ্র সুরে
জন্তুরা সব তাতেই পালায়, ভয় পেয়ে থাকে শ হাত দূরে।

দৃঢ়চেতা আর প্রত্যয়ী তিনি, প্রশস্ত তাঁর হৃদয়-মনও
(যুদ্ধের মাঠে) মৃত্যুমুখেও তিনি হয়ে যান সিংহ কোনো।

নবীজি, আপনি নেই, আপনার ক্ষিপ্র অশ্ব এসেছি আমি
কুয়াশার মতো ঘন ধুলো তার খুরে উড়ে গিয়ে আসছে নামি।

আপনার শানে নিবেদিত এই সৈনিকদল অগ্রগামী
অসির আঘাতে শির যেতে পারে, তবুও কি আর আমরা থামি!

কাসীদাতু বানাত সুআদ

হযরত কা'ব ইবন যুহাইর (রা.)

কাব্যানুবাদঃ রুহুল আমীন খান

খোদার নবী নূরের রবি
জগৎ লভে জ্যোতি তাহার
খোদার অসিগুলোর তিনি
অসি যে এক তীক্ষ্ণ দ্বিধার।
কুরেশকুলের যেসব যুবক
করল খোদার দীনকে কবুল
পাক মদীনায় যেতে তাদের
হুকুম দিলেন খোদার রাসূল।
হুকুম পেয়ে টগবগে সব
তরুণ যুবা জমায় পাড়ি
কেবল ভীরু দুর্বলেরা
গেল না কেউ মক্কা ছাড়ি।
উচ্চ নাসা সেসব জোয়ান
সমুখ রণে কাপাঁয় ধরা
দেহে তাদের দাউদ নবীর
বজ্র কঠিন বর্ম পরা।
শুভ্র উজাল সেই কবচে
গোটা দেহই যায় যে ঢাকা
পরস্পরে যেন 'কাফার'
রজ্জুতে তা আটকে রাখা।
শত্রুসেনার আক্রমণে
তারা যেমন হয় না ভীত
বৈরী পরেও আঘাত হেনে
হয় না তেমন আনন্দিত।
ধবল উটের মতই তারা
যায় তখনো সামনে তেড়ে
খর্ব কালো যোদ্ধারাও
পালায় যখন যুদ্ধ ছেড়ে।
লড়াই মাঠে সমুখ থেকেই
বর্শা তাদের বক্ষে লাগে
ত্যাগ করে না রণভূমি
সেই বীরেরা মরার আগে।

কাসীদা-ই-বুরদাহ

(প্রসঙ্গ: রাসূল ﷺ-এর মুজিযা ও দ্বীনের দাওয়াত)

ইমাম বুসীরী

কাব্যানুবাদ: ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

চলে এসেছিল আহবানে তাঁর মাথা নত করে বৃক্ষরা ছুটে,
পা নেই তবু এসেছিল তারা কাণ্ডের পরে ভর করে হেঁটে।

সারি সারি গাছ লিখেছিল যেন একটি চরণে গুণগান তাঁর,
লিখেছিল তারা ডালপালা দিয়ে শোভন লিপিতে মাঝে রাস্তার।

মেঘেরা যেমন তিনি যেথা যান সঙ্গে সঙ্গে সেথা যায় সরে,
ছায়া দিতে তাঁরে উনানের কড়া খরতাপ হতে প্রখর দুপুরে।

খণ্ডিত সেই চন্দ্রের আমি শপথ করি যে সকলের কাছে,
নবী-হৃদয়ের সঙ্গে তাহার অনুপম এক মিল রহিয়াছে।

কল্যাণ আর মহত্ত্ব কত জমা করেছিল সেই দিন গুহা!
কাফিরগণের সকল দৃষ্টি অন্ধ যে ছিল দেখে নাই উহা।

গুহার ভিতরে সত্য নবীজি, সিদ্দীক তাঁর সঙ্গী সেথায়,
বিচলিত নন, শত্রুরা বলে হয় তো কেহই নাই এ গুহায়।

ওরা ভাবিয়াছে, থাকিতেন যদি শ্রেষ্ঠ নবীজি গুহার ভিতরে,
জাল বুনিত না মাকড়সা আর কবুতর হেথা আসিত না উড়ে।

আল্লাহর দেওয়া সুরক্ষা তাঁর যথেষ্ট ছিল বাঁচাতে জীবন,
শক্ত সাঁজোয়া উচ্চ দুর্গ ছিল না তাঁহার কিছু প্রয়োজন।

কালের চক্রে কষ্টে পড়িয়া আশ্রয় তাঁর যখনই চেয়েছি,
নিরাপদ আর অলঙ্ঘনীয় শরণ তাঁহার তখনই পেয়েছি।

যখনই চেয়েছি দুই জাহানের প্রাচুর্য আমি নবীজির কাছে,
তখনই পেয়েছি অকাতরে দান, সর্বশ্রেষ্ঠ দান সেথা আছে।

অমান্য তুমি করিও না ওহী, স্বপ্নেও তাঁর আসে যদি তবু,
নয়নযুগল ঘুমিয়ে গেলেও হৃদয় তাঁহার ঘুমায় না কভু।

এসেছিল ঐ ওহী তাঁর কাছে উপনীত হলে নবুওতে তাঁর,
অবকাশ নাই সেই সময়ের স্বপ্নের বাণী না মানিবার।

আল্লাহ মহান! ওহী তো কখনও অর্জন করা যায় না চাহিলে,
অপবাদ দেওয়া যায় না যে কভু নবীকেও তিনি গায়েব বলিলে।

উজ্জ্বল তাঁর মুজিযাসমূহ, কাহারো নিকট গোপন তা নয়,
বিহনে তাহার মানুষের মাঝে ন্যায্য বিচার কায়েম না হয়।

হস্ত তাঁহার পরশ বুলিয়ে পীড়িতেরে কত আরোগ্য দিল!
তেমনি পাপের বন্ধন হতে কত অভাগারে মুক্ত করিল!

সজীব হইল নিরস বছর দুআয় তাঁহার ফলিল ফসল,
কালো আঁধারের সুকঠিন কালো রং হল তার শুভ্র উজ্জ্বল।

মেঘের প্রবল বর্ষণে, সব উপত্যকাই যেন তার ফলে
প্লাবিত হয়েছে সাগরের স্রোত কিবা বৃষ্টির বাঁধভাঙ্গা ঢলে।

মীলাদুন্নবী (সা.)

মূল: আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী

কাব্যানুবাদ: রুহুল আমীন খান

চকমকিয়ে উঠল্ল জ্বলে বিশ্বলোকের ভাগ্য-তারা
মানব-রতন নবী যখন এলেন ধরায় জাগল সাড়া।
বিশ্ববাগের কুসুম কলি ঝরল যখন হিমেল ঝড়ে
এলো নবীন বসন্ত ফের আসলে নবী ধরার পরে।
মুক্তো ছিল বিশ্বলোকের দৃষ্টি আড়াল গুপ্ত দূরে
আবির্ভাবে সেই মুকুতার আরশ-ফরশ হাসল নূরে।
বিশ্বপালক আল্লাহ তাআলা রহম সেথা দয়াল নবী
যেইখানে রব আল্লাহ তাআলা রহম সেথা রসূল-রবি।
মুহাম্মদের সত্তা-জ্যোতি দীপ্ত আহাদমোতির মাঝে
আল্লাহ আহাদ গুলিস্তানে গুল আহমাদ ওই বিরাজে।
সৃজনলীলার আদিম তিনি সৃষ্টি তাঁহার সবার আগে
জহুর তাঁহার সবার শেষে এই দুনিয়ার মানব বাগে।
নবীর সে নূর দেখল না যে নিবাস তাহার জাহান্নামে
যে খোশনসীব দেখল সে নূর শান উঁচু তার সব মাকামে।
হে কলন্দর নয়ন তোমার করো উজাল নবীর নূরে
নাই পরোয়া জাহান্নামের শাস্তি সাজা থাকবে দূরে।

মুক্তির এক পথ

আ. শ. ম. বাবর আলী

মুক্তির এক পথ ইসলাম নাম তার,
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তুমি যেগো আল্লাহর।
করো তার প্রমাণ চিন্তা ও কর্মে,
শান্তির দিশা আছে ইসলাম ধর্মে।
ভালাবাসো মানুষকে শান্তির জন্য,
মুসলিম নামে তবে হবে তুমি গণ্য।

ইসলাম ধর্ম যে ধনী ও নিঃস্বের,
শান্তি চায় সে গোটা সারা বিশ্বের।
ইসলাম চায় যে সকলের সাম্য,
সবজনে বন্ধুতা ইসলামে কাম্য।
হানাহানি কাটাকাটি অরাজক ভ্রান্তি,
দূর করে জীবনের সব সুখ শান্তি।
পথ ভুলে হলে কেউ বিপথের যাত্রী,
জীবনটা ঢেকে দেয় কালো অমারাত্রি।
এমনিতে হয়ে যায় জীবনটা নষ্ট,
জীবনের প্রতি পদে আসে দুখ্ কষ্ট।
আতরাফ থেকে যদি আশরাফ হতে চাও,
মুক্তির পথ তবে ইসলামে খুঁজে নাও।

অক্ষম কান্না

কালাম আজাদ

ইয়া রাসূলাল্লাহ!
আমি এক অধম কবি দেশ বাংলার
মুবারক কদমে আপনার
একখানা কবিতার উপহার রেখে যাবো বলে
কতকাল আহা কতকাল থেকে
কলমের কসরতে কসরতে
ব্যর্থ রাতগুলো করেছি কাবার!

হে রহমতের নবী-হে রহমত আল্লার
আমাকে রহম করুন
আমি আপনার কদম মুবারকে
একটি কবিতা যেনো রেখে যেতে পারি।

কিভাবে তা হয়?
শব্দ যে উচ্চতায় পৌঁছতে পারে না
কবিতা যে মহত্বের চূড়ায় উঠে না
আপনি তো চিরদিন সেখানে ছিলেন
আপনি তো চিরদিন সেখানে আছেন
কি করে পৌছাবো আমি সেইখানে
আমার কবিতা
কি করে পৌঁছাবো আমি আমার শব্দাবলী
আপনার কদমে।

হে আল্লার নবী!
আল্লার কসম! আমি আপনাকে ভালোবাসি বলেই
ভালোবাসি আল্লার দ্বীন
আপনাকে জানি বলে জানি
আরশ কুরসী-কবর-হাশর
ইয়াউমুদ্দীন।
জানি জান্নাত ও নার-আখিরাত
আছে সীমাহীন।

জানি এই আমার ভেতরে
যে সামান্য আলো
সে যে আপনারই কৃপা
এই কৃপা না পেলে যে আমি
অন্ধকারে হীন একাকার,
হে বন্ধু আল্লার।

হে খোদার প্রিয়
আমি, আপনাকে বড় ভালোবাসি
আর আপনাকে ভালোবাসি বলেই
মানব জাতিকে ভালোবাসি
ভালোবাসি পশু পাখি
ভালোবাসি বৃক্ষ লতা
ভালোবাসি প্রাণেরে-
পানির, বায়ুর আর এই মৃত্তিকার।
এ শুধু আপনারই জন্য
হে রাহমাতুল্লিল আলামীন
হে প্রিয় আল্লার।

আর আমি তো আজন্ম আপনার গোলাম
আমি যে আপনারই পদচ্ছায়া তলে
চেয়েছি হয়ে যেতে এক ধূলিকণা।
মদীনার স্বপ্নালোকে হয়ে যেতে পাগল উন্মনা।

অথচ হয় না,
আমার শব্দ যে আপনার উচ্চতায় পৌঁছতে পারে না
আমার কবিতা যে আপনার কদম মুবারক ছুঁতেই পারে না।

তোমার কিনারে

মুজাহিদ বুলবুল

১.
একটা জীবন যদি তোমার শানে
গান গেয়ে খুঁজে পায় জন্মের মানে
হাওয়া ভরে উড়ে যদি আমার গযল
স্রোতের ধারায় মিশে এলোমেলো জল
বাকী সব পড়ে থাক এধারে-ওধারে
তোমার পাগল থাক তোমার কিনারে।

২.
তারপর বুঝে নিই এইভাবে আগুনও লুকায়
বুকফাটা চিৎকার পাথরের পাহাড়ে মিলায়!
শুকনো দৃষ্টিজুড়ে শুধুই তো ধুলোর খবর
কে জানে কতটা জল ধরে এই মনগহ্বর!
কতটা যত্নে ওড়ে পথহারা এলোমেলো মেঘ
কেবলই অপেক্ষা একদিন ঝরবে আবেগ—
একদিন ভেসে যাবো সঞ্চিত বেদনার বানে
আমার সমাপ্তি হবে প্রেমময় নবীজি যেখানে।

কাঙালের ধন

সালমান ফরিদ

যতোটা অভাব হলে পরে বোঝা যায় তোমার অনুপস্থিতি
আমি ততোটাই অভাবে বেড়ে উঠছি, হে কাঙালের ধন!
যতোটা বেদনায় ভেতর ও বাহির পুড়ে গেলে ক্ষত তীব্র হয়
আমি ততোটাই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছি, হে মানিক রতন!

আজ বুঁদবুদ্ধি এলোমেলো হওয়া ক্লান্ত পথিক আমি
এক টুকরো নির্ভরতার খুঁজে বারবার ভেসে গেলে
ঢেউ এনে ভিড়িয়ে দেয় তীরে। আবার ভেসে যাই।
আবার ফিরে আসি। কচুরিপানার মহাজনি ছাড়া
অবশিষ্ট আমার এখন আর কিছুই যে নাই!

অথচ দূর থেকে দেখি তাহারে, বাতিঘর থেকে ইশারাও পাই
ক্লান্ত পথিক। কতোটা দৌড়ালে পরে মিলবে তাহার দেখা
সেই সত্যে যখন বড্ড বেখবর, আপ্লুত হই আবার
আবারও শূন্যতায় মর্সিয়া হয়ে ভেসে উঠো তুমি।

জানিয়ে দাও পথের বাঁক! পথের সীমান্ত রেখা!
তবুও হাতড়াই, খুঁজে ফিরি অভাগার মতো—
কেনো পাই না চোখের সীমায়?



যুগে যুগে খোদাদ্রোহিতার উদ্ভব হয়েছে। আবার তাদের ভয়াবহ পরিণতিও দেখেছে পৃথিবীবাসী। প্রিয়নবী e এর সাথে যারাই বেয়াদবি করেছে, তাঁর সুন্নাহকে অবজ্ঞা করেছে তাদের পরিণতি সেই জাহিলিয়াতের আবূ জাহল, উৎবা, শাইবাদের মতোই হয়েছে। এমনই এক পাপিষ্টের গল্প শুনব আজ।

ইরাকের প্রসিদ্ধ নগরী বসরা। এরই সীমান্তে বাস করতো বদমেজাজী স্বভাবের এক ব্যক্তি। সকলের নিকট সে আবূ সালামা নামেই পরিচিত।

আবূ সালামা ছিল খুবই খারাপ প্রকৃতির লোক। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূরানী সুন্নাত নিয়েও উপহাস করত। সে মনে করত, বর্তমান এই প্রগতির যুগে সেই প্রাচীন যুগের সুন্নত আর চলবে না, চলতে পারে না। এজন্য সুন্নতের কথা শুনলেই তার গা জ্বালা শুরু হয়ে যেত। ফলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে মুখে যা আসতো তাই অবলীলাক্রমে বলে বেড়াতো। একটি বারের জন্যও সে চিন্তা করতো না যে, সুন্নাত নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করলে, সুন্নাতের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করলে শুধু গুনাহ যে হয় তা-ই নয়, ঈমানও চলে যেতে পারে।

একদিনের ঘটনা। আবূ সালামা কোনো এক মজলিসে বসে আছে। এমন সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত- মিসওয়াকের ফদীলত সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলে সে বলে উঠে, খোদার কসম, আমি আমার পিছনের রাস্তা ব্যতীত অন্য কোথাও মিসওয়াক ব্যবহার করব না (নাউযুবিল্লাহ)। এ কথা বলে সত্যি সত্যি সে যা বলেছে তাই করে দেখালো।

এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সকলেই হতবিহবল হয়ে পড়ে। কেউ কেউ সাহস করে তাকে ধিক্কার দিয়ে বলেই ফেললো, আবূ সালামা! একী করলে তুমি? নবীর সুন্নাতের সাথে এমন বেয়াদবি! জানি, তুমি সুন্নাতকে ভালোবাস না, সুন্নাতের কথা তুমি শুনতেই পার না। তাই বলে প্রকাশ্যে তুমি সুন্নাতের এতবড় অবমাননা করবে, তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। এক্ষুণি তুমি তাওবাহ কর। নইলে সেদিন হয়ত বেশি দূরে নয়, যেদিন তোমাকে এর জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে, কঠিন ও মর্মন্তুদ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

আবূ সালামা এসব কথা মোটেও আমলে নিল না। উপরন্তু সে মুখ ভেংচিয়ে উদ্ধত ভাব নিয়ে বলতে লাগলো, রাখো! তোমাদের এসব কথা। আমি এগুলোকে মোটেও ভয় পাই না। সামান্যতম পরওয়াও করি না। তার এসব কথায় সবাই ক্ষুব্ধ হলো এবং তার পরিণতি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দিলো।

ঘটনার নয় মাস পরের কথা। একদিন আবূ সালামার পেটে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হলো। ধীরে ধীরে পেট ফুলতে শুরু করে। ফুলে পেটের অবস্থা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, দেখলে মনে হবে সে যেন অন্তসত্ত্বা, সন্তান সম্ভাবা। তার আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম। চারদিকে লোকজনের ভীড় জমতে শুরু করে। ডাক্তার কবিরাজ বিরামহীনভাবে চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। এমনকি তারা ব্যথার কোনো কারণও উদঘাটন করতে পারছে না। ব্যথার প্রচন্ডতায় বারবার সে বেহুশ হয়ে পড়ছে।

লোকে বলাবলি করতে লাগলো তার এই অবস্থা ঐ মারাত্মক পাপেরই নির্মম পরিণতি। ঐ দিন সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের সাথে যে বেয়াদবি করেছে এর প্রতিফল সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

ব্যথার দুঃসহ যন্ত্রণায় আবূ সালামা বারবার কঁকিয়ে উঠছে। তার বিকট চিৎকার ধ্বনি ষাড়ের শব্দের ন্যায় শোনা যাচ্ছে। তার মর্মভেদী আর্তনাদ মর্তের মাটি ছাড়িয়ে আল্লাহর আরশ বুঝি কাঁপিয়ে তুলছে। কিন্তু হায়! সময়ের তালে তালে ব্যথার মাত্রা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের কোনো ঔষধই কাজ করছে না। বরং প্রতিটি ঔষধই যেন তার পেটে গিয়ে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে এবং ব্যথার মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলছে। এভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সে ইঁদুরের ন্যায় একটি বাচ্চা প্রসব করে।

বাচ্চাটির চারটি পা। মাথাটা ঠিক মাছের মতো। দাঁতগুলো মুখের বাইরে চলে এসেছে। পিছনে ছিল একটি লেজ। বিঘত পরিমাণ লম্বা । এর পিছনের অংশটুকু ছিল খরগোশের পশ্চাৎদেশ সদৃশ। অদ্ভুত ও ভয়ংকর আকৃতির এ বাচ্চাটি বাইরে আসার সাথে সাথে বিকট স্বরে পরপর তিনটি আওয়াজ দেয়। অতঃপর আবূ সালামার এক মেয়ে বাচ্চাটির মাথায় আঘাত করলে সেটি মারা যায়। বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর দুদিন পর্যন্ত আবূ সালামা বেঁচে ছিল। তৃতীয় দিনে সে মৃত্যুবরণ করে। আর এভাবেই একজন সুন্নাহ দ্রোহীর সলিল সমাধি ঘটে। মহান আল্লাহ যেনো আমাদেরকে সুন্নাতে নববীর আলোকে জীবনযাপন করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

রাসূলে আরাবী

আব্দুল মোহাইমিন মারজান

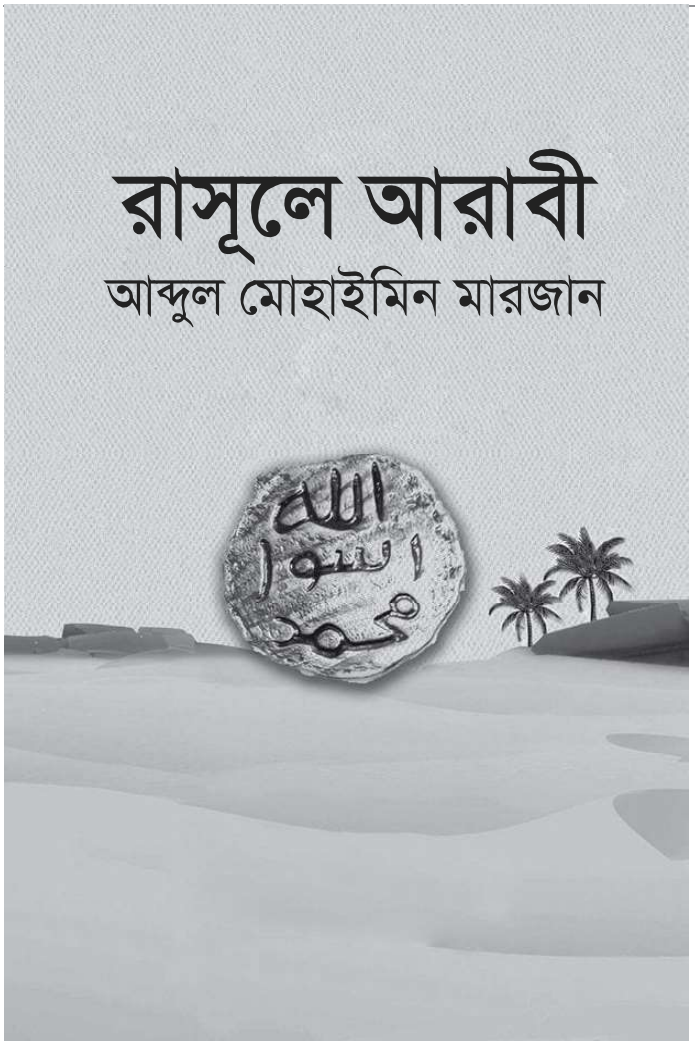

৫৭০ ঈসায়ীর কথা। যখন নবীবিহীন প্রায় ছয়শ বছর গত হয়ে গেছে। ঈসা আলাইহিস সালামের মুষ্টিমেয় অনুসারী ব্যতীত সকলেই তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ ভুলে গেছে। পৃথিবী ও পৃথিবীবাসী হয়ে পড়েছে প্রাণহীন। খাবারের অভাবে যেমন মানুষের মৃত্যু হয়, তেমনি একজন নবী ও নববী শিক্ষার অভাবে পৃথিবীবাসী আত্মিক দিক থেকে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। সে সময়টায় পৃথিবীবাসী ছিল অজ্ঞতার এক ঘোর অন্ধকারে। মিথ্যা, পাপাচার, হত্যা, লুণ্ঠন, মদ্যপান, জুয়া, যৌনাচার ও কথায় কথায় ঝগড়া-বিবাদ এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ছিল তাদের নিকট স্বাভাবিক ব্যাপার । একে অপরের মধ্যে বিন্দুমাত্র ঐক্য ছিল না। তাদের নিকট বংশগত কৌলিণ্য ও গোত্রগত মর্যাদা এত প্রকট ছিল যে, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা সমাজের সর্বত্র বিরাজমান ছিল। অরাজকতা, কুসংস্কার, নিন্দনীয় কার্যকলাপ অপ্রতিহতভাবে বেড়ে চলছিল। খুনের বদলা খুন, অহেতুক রক্তপাত, অন্যের ভূমি দখল ছিল নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার। অনৈতিক কার্যকলাপ, মূর্তিপূজা এবং মদ ও মদিরার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা ছিল তাদের জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহকে তারা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। আর আল্লাহকে উপেক্ষা করে যে-জীবন পরিচালিত হয়, সে জীবনের কী-ই বা অর্থ থাকতে পারে? আখিরাত সম্পর্কে তারা ছিল ঘোর অন্ধকারে। জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল ভ্রান্ত পথে। মূল্যবান সময় গুনাহের কাজে খরচ করে তারা ধাবিত হচ্ছিল নির্মম মৃত্যুর দিকে। এমন ভয়ানক পরিস্থিতিতে তাদের রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের জীবনে আবারও সুখ-সমৃদ্ধি ও সাফল্য অর্জনের পথ খুলে দেন। তিনি হিদায়াতের জন্য রহমতস্বরপ প্রেরণ করেন মানবতার মুক্তির দূত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। অপেক্ষার সুদীর্ঘ প্রহর শেষে ৫৭০ ঈসায়ীর ১২ রবীউল আউয়ালে মুক্তির বার্তা নিয়ে নবীজি (সা.) এর আগমনটা কতই না অসাধারণ ছিল! যে আগমনে পৃথিবীর ভাগ্যাকাশে শান্তির সূর্য উদিত হয়; ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে যায়। তখন তাদের মনে হয়, তারা যেন নতুন জীবন লাভ করেছে। তাঁর আগমনটা হয় সুরক্ষিত সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে, সায়্যিদাহ আমিনার ঘরে। তিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময় পিতা আব্দুল্লাহ যাবিহকে হারান। রাসূলে আকরাম (সা.) এর জন্মের পর দাদা আব্দুল মুত্তালিব লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তিনি নাম রাখেন "মুহাম্মদ"। মুহাম্মদ- একটি প্রতীকী নাম, অর্থ-চিরপ্রশংসিত। এই একটিমাত্র নামের মাঝে তাঁর সকল পরিচয় বাঙময় হয়ে ওঠে। কারণ, সর্বকালের সবার কাছে প্রশংসিত হতে হলে উন্নত নীতি-নৈতিকতা, উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি, সমুন্নত মানবিক মূল্যবোধ, অসম সাহসিকতা, অনিঃশেষ দয়া এবং ইহকালীন ও পরকালীন সংকট মুকাবিলায় অনুসারীদের যুগান্তকারী দিক-নির্দেশনা প্রদানের অসামান্য যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, তবেই একজন মানুষ সকল যুগের সবার কাছে স্মরণীয়, বরণীয় ও প্রশংসিত হতে পারে। তাঁর আরেকটি নাম হলো আহমাদ; যা মাতা আমিনা আদর করে ডাকতেন। অর্থ- অত্যাধিক প্রশংসিত। "আহমাদ" ও "মুহাম্মদ" একই ধাতুমূল থেকে উৎসারিত দুটি শব্দ। তাঁর প্রশংসা ও গ্রহণযোগ্যতাকে সর্বজনীনতা ও সর্বকালীন করে তুলে ধরার জন্যই এই নামের উদ্ভব হয়েছে। ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর এই গুণবাচক নামটি উল্লেখ করে স্বজাতির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, শীঘ্রই 'আহমদ' নামের একজন নবী আসবেন; তিনি মানুষকে সত্যের পথে আহবান করবেন। নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে আল্লাহ তাআলা মহান একটি লক্ষ্য রেখে তাঁর প্রিয় হাবীবকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। আর সেই উদ্দেশ্যটি হলো তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা-যাতে পৃথিবীবাসী মহান আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করে। একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে। এ দুটি বিষয়ে অন্য কাউকে তাঁর শরীক বা সমকক্ষ মনে না করে। সর্বোপরি সবাই যেন গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠে-"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"।

বালাগাল উলা

মূল: শেখ সাদী

কাব্যানুবাদ: মোহাম্মদ খছরুজ্জামান

উচ্চাসনে পৌঁছে গেলেন
পূর্ণরূপে যোগ্যতায়
আঁধার কালো দূর হলো সব
উজ্জ্বলতম নূর প্রভায়।

অতীব সুন্দর স্বভাব খাসলত
নন্দিত আচার আচরণ
দুরূদ পড়ো নবীর পরে
আর পরিবার পরিজন।

জাগ্রত মৌচাক

ইয়াহইয়া আহমদ চৌধুরী

এই প্রেম ভালবাসা
আল্লার ওয়াস্তে
যদিও দেখাই শুধু
রিক্ত এ হস্তে।

ঠলবেনা দলবেনা
দৃঢ় সংকল্প
হঠাতে ও পারবেনা
কোন ভুমিকম্প।

ধরেছি এ রশিটাকে
মুক্তির জন্য
মদীনার কাফেলার
সাথী হয়ে ধন্য।

বিশ্বাসে হের ফের
নেই কারো কিঞ্চিৎ
ওমরের বাহুবল
পাঞ্জাতে নিশ্চিত।

সমসের হাতে নেব
জিহাদী তামান্নায়
ছুঁড়বে না ঢিল আর
করিস না অন্যায়।

হুকমেই লড়বো
রাহবার দিলে ডাক
ভয়ে ভীত নয় কভু
জাগ্রত মৌচাক।

ফরিয়াদ

এস এম মনোয়ার হোসেন

নবীর বাড়ি যাওয়ার তরে ছটফট করে প্রাণ
কেমন করে যাবো করি উপায়টা সন্ধান—

দাও দয়াময় শক্তি দাও আমায় নিয়ে যাও
রওজা পাকের পাশে নিয়ে হৃদয়টা জুড়াও
বিমোহিত হবো আমি পেয়ে জান্নাতি ঘ্রাণ।

যে নবীজির উসিলতে সৃজন জগৎরাজি
প্রেমে বিভোর হয়ে করি যিয়ারতের আর্জি
ওই মদিনায় গেলে জীবন হবে পুণ্যবান।

জীবন উজাড় করে দেবো নবীর ভালোবাসায়
কাছে গিয়ে ভেজব সালাম মন কাঁদে আশায়
তাঁর ভালোবাসায় মুখরিত সারাটা জাহান।

যাঁর পরশে এই ধরণীর কাটে অমানিশা
যিনি হলেন প্রিয় রাসূল মুক্তিরও দিশা
কণ্ঠে তুলে দিলেন যিনি সাম্য-মৈত্রীর গান।

দাও গড়ে বন্ধন যিনি সাকিয়ে কাওসার
যাঁর শাফায়াত পেলে অধম হয়ে যাবে পার
ভয়াল দিনে দিদার পেলে শান্ত হবে প্রাণ।

নসীহত

হুসাইন আহমদ

বলিলেন রাসূল প্রিয় আনাস
করিও পাঁচটি কাজ
পুণ্যে তুমি পূর্ণতা পাবে
দুজাহানে পাবে রাজ।

সহীহভাবে উযূ করিও
হায়াত বৃদ্ধি পাবে
সাক্ষাতে কারো সালাম দিও
পূণ্য বেড়ে যাবে।

সফর শেষে যখন তুমি
ফিরবে আপন নীড়ে
নীড়বাসীকে সালাম দিও
কল্যাণ নিবে ঘিরে।

নিত্যদিনে চাশতের নামায
আদায় করে নিবে
পূণ্যবানদের দ্বীনদারিতা
রব তোমাকে দিবে।

ছোটদের সদা করবে স্নেহ
বড়দের সম্মান
আখিরাতে তবে পাবে আমার
প্রিয়দের সাথে স্থান।

নবী কামলিওয়ালা

জামান আহমদ

আরবের বুকে যদি জন্ম নিতাম
চরণ ধুলি নিয়ে ধন্য হতাম—
যাঁর পরশে ইহ-পরকাল উজালা
রহমতে আলম নবী কামলিওয়ালা।

অন্ধকারে এসে আলো ছড়ালে
সম্বলহীনদের তুমি পাশে দাঁড়ালে—
তৈরি হলো এক নতুন সমাজ
দূর হলো মানুষের দুঃখ জ্বালা।

মধুর ব্যবহারে সকলে অবাক
উম্মত দরদী প্রিয় রাসূলে পাক—
সবুজ ওই মিনারটা দেখবো বলে
আশায় আশায় বসে গেঁথেছি মালা।

জান্নাতে দিও ঠাঁই

সেলিম আহমদ কাওছার

দয়াল নবীর উম্মত আমি
পাপ করে যাই তবু
রোজ হাশরের ভয়াল দিনে
দয়া করো প্রভু।

পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে
তুলছি দু'টি হাত
রোজ হাশরে নবীর গুণে
পাই যেনো নাজাত।

আমল বিনে কঠিন দিনে
যদি আটকে যাই
দয়াল নবীর উম্মত বলে
ছাড়া যেনো পাই।

দিও না দোযখে ফেলে
পাপীতাপীর দলে
দিও প্রভু জান্নাতে ঠাঁই
নবীর উম্মত বলে।

মক্কা বিজয়ে যাদের ক্ষমা করা হয়নি

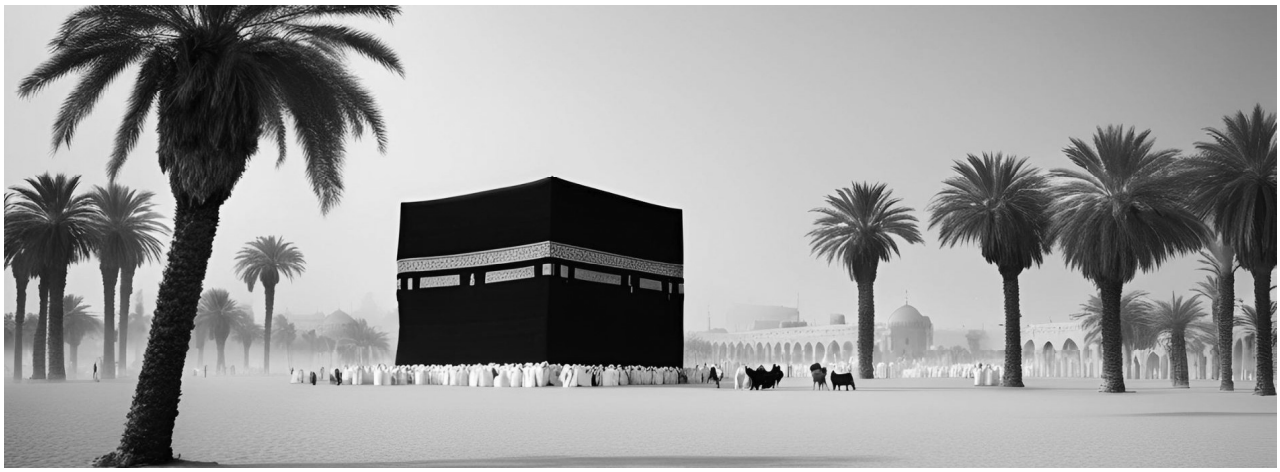

মক্কা বিজয় ইসলামের ইতিহাসে বাঁকবদলকারী এক যুগান্তকরী ঘটনা। মক্কা বিজয়ের পর আরব ভূখণ্ডে ইসলামের অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে এবং তার আলো ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। অষ্টম হিজরীর রামাদান মাসে ঐতিহাসিক এই বিজয় অর্জিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সংঘাত ও রক্তপাত এড়ানোর সাধারণ নির্দেশনা জারি করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বলেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। যাও তোমরা আজ মুক্ত।' (কাশশাফ : ৬/৪৫১)

তবু সামান্য কয়েকজন গর্হিত অপরাধ করায় তাদের ক্ষমা করা হয়নি।

সায়্যিদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ ﷺ মানবিক ক্ষমার দিনও চার পুরুষ ও দুই নারীর বিরুদ্ধে মৃত্যু পরওয়ানা জারি করেন। সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন । তবে চার পুরুষ ও দুই নারী ছাড়া। তিনি বলেন, তাদের যদি কাবার গিলাফ আঁকড়ে ধরা অবস্থায়ও পাও তবু তাদের হত্যা করো।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২৬৮৩)

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলো,

১. আবদুল্লাহ ইবন খাতাল: সেও ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সাদাকাহ আদায়ের জন্য পাঠালে সহকর্মীকে হত্যা করে সে মক্কায় পালিয়ে যায় এবং ইসলাম ত্যাগ করে। সাঈদ ইবন হুরাইস মাখজুমী এবং আবূ জাররাহ আসলামী (রা.) তাকে হত্যা করেন।

২. হুরাইস ইবন নুকাইস: তার অপরাধ ছিল সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই মেয়েকে শারীরিকভাবে আঘাত করেছিল। আলী (রা.) তাকে হত্যা করেন।

৩. হুবাবা ইবন মুকিস: সে একজন আনসারী সাহাবীকে হত্যা করে এবং ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় পালিয়ে যায়। নামিলা বিন আবদুল্লাহ (রা.) তাকে হত্যা করেন।

৪. সাদ ইবন আবদুল্লাহ: প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে এবং পরবর্তী সময়ে মুরতাদ হয়ে মক্কার কাফিরদের সঙ্গে যোগ দেয়। সে উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর কাছে আশ্রয় চাইলে তাঁর সুপারিশে রাসূল ﷺ তাকে ক্ষমা করেন। ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার পর সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে।

৫. আবদুল্লাহ ইবন খাতালের বাঁদি ফারতানা: সে তার মুনীবের সঙ্গে কবিতা ও গানে গানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করত। তাকে হত্যা করা হয়।

৬. আবদুল্লাহ ইবন খাতালের বাঁদি কারিনা: সেও তার মনিবের সঙ্গে কবিতা ও গানে গানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করত। ফারতানা থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে সে অনুতপ্ত হয়, নিরাপত্তা লাভ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

গ্রন্থনাঃ মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দ

১১১. صُنْدُوْقٌ (সুন্দুকুন): বাংলা সিন্দুক/সন্দুক। বাক্স, কাঠের তৈরি বাক্স।

১১২. صَدْرٌ (সাদরুন): বাংলা সদর। বুক, প্রধান, বড়। জেলার প্রধান শহর। যেমন- সদর উপজেলা, সদর দপ্তর।

১১৩. صَاحِبٌ (সাহিবুন): বাংলা সাহেব/ছাহেব। সঙ্গী, সাক্ষী, স্বত্ত্বাধিকারী, কর্তা, সুহবত দানকারী, সম্মানিত বুযুর্গ। ছাহেব শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ 'ছাব'।

১১৪. صُوْفِيٌّ (সুফিয়্যুন): বাংলা সুফী। صُوْفٌ অর্থ পশম, ছাগলের লোম। বুযুর্গ ব্যক্তিরা একসময় পশমী কাপড় পরতেন বলে সুফী নামে খ্যাত।

১১৫. صُوْرَةٌ (সুরাতুন): বাংলা সুরত। আকার, আকৃতি, নমুনা, মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদি।

গ্রন্থনা: মোহাম্মদ খছরুজ্জামান



আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আশা করি আপনি ভালো আছেন। আমি পরওয়ানার নিয়মিত পাঠক। পরওয়ানার আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমি পরওয়ানার আবাবীল ফৌজের সদস্য হতে আগ্রহী। আশা করি আমাকে সদস্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে বাধিত করবেন।

আমিনুল হক সাদী

সিলেট ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এণ্ড কলেজ, সিলেট সেনানিবাস, সিলেট

-আন্দালিব ভাই

নিয়মিত পাঠক হিসেবে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবাবীলের লেখাগুলো তোমার ভালো লাগে শুনে খুশি হলাম। আবাবীল ফৌজ তোমাদেরই পাতা। তোমরা পড়বে লিখবে এ পাতায়। তোমার সদস্য আবেদন গ্রহণ করা হলো। তোমার নাম ঠিকানা পাঠিয়ে দাও পরওয়ানার ঠিকানায় অথবা ইমেইলে। ছাপা হবে পরের সংখ্যায়।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আমি পরওয়ানার নতুন পাঠক। আগে মাঝেমধ্যে পরওয়ানা পড়তাম। কিন্তু ইদানিং মাস শেষ হতেই পরওয়ানা হাতে না পেলে ভালো লাগে না। এখন থেকে পরওয়ানার কোনো সংখ্যা না পড়লে খারাপ লাগে। আমি পরওয়ানার উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

তিহাম সারওয়ার

স্কলার্সহোম, শিবগঞ্জ, সদর, সিলেট

-আন্দালিব ভাই

নতুন পাঠক হিসেবে তোমাকে পরওয়ানা ভবনে স্বাগত জানাই। এখন থেকে নিয়মিত পড়বে, লিখবে এবং তোমার বন্ধুদের লিখতে উদ্বুদ্ধ করবে। তোমার চিঠির জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আশা করি আপনি সহীহ সালামতে আছেন। নতুন স্বাধীনতায় আপনাকে শুভেচ্ছা। দেশের আপামর ছাত্রজনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে দেশ একটি চরম দুর্বিসহ থেকে মুক্তি পায়। মানুষ পায় স্বস্তি। পরওয়ানা যেন নতুন দেশের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে এই প্রত্যাশা রাখি।

কামরুল হাসান

এম.সি কলেজ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই

তোমার চিঠির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, দুর্নীতি ও দুঃশাসনমুক্ত দেশ গড়তে তোমাদের মতো কিশোররাই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। তোমাদের প্রিয় পরওয়ানা দেশ সংস্কার কাজে অবশ্যই তোমাদের পাশে থাকবে সবসময় ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

কেমন আছেন। আশা করি খুব ভালো আছেন। আমি পরওয়ানা আগস্ট মাস হাতে পেলাম। আগস্টে গল্প মাত্র দুটি ছিল। যদিও গল্প দুটিই চমৎকার ও শিক্ষনীয় ছিল। ব্যথার দান গল্প থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে। মুচি গল্পটিও ভীষণ ভালো ছিল। গল্পে সততার পরিচয় ফুটে ওঠেছে সুন্দরভাবে। লেখককে ধন্যবাদ এরকম শিক্ষণীয় গল্প উপহার দেওয়ার জন্য। সব মিলিয়ে দুটি গল্পই ছিল চমৎকার। তবে আমাদের প্রত্যাশা গল্প যেন আরও বেশি বেশি ছাপা হয়।

মাহফুজুর রহমান রিফাত

আনন্দনগর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, রামপুরা, ঢাকা

-আন্দালিব ভাই

প্রিয় রিফাত, তোমার দীর্ঘ চিঠির জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আগস্ট সংখ্যার দুটি গল্প তোমার ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। পাশাপাশি তোমার দাবি হলো গল্প যেন আরও বেশি ছাপা হয়। তোমার দাবির সাথে একাত্মতা জানিয়ে বলতে চাই, গত সংখ্যায় মাত্র দুটি গল্প ছাপার পেছনে কারণ ছিল গল্পের পরিধি। আমরা কিন্তু গল্পের সংখ্যা হিসেব করে ছাপা করি না, ছাপা হয় পত্রিকার পৃষ্ঠার পরিধি হিসেবে। এ কারণে অনেক সময় ছোট গল্প হলে সংখ্যায় বেশি ছাপানো যায়, আর তুলনামূলক বড় হলে গল্পের সংখ্যা কমে যায়। তবে আমরা চেষ্টা করব, যেন তোমার দাবির প্রেক্ষিতে গল্পের সংখ্যা বাড়াতে পারি। সবশেষে তোমার সুন্দর পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

ধু-ধু মরুর সূর্য তখনো জেগে ওঠেনি। ঘুম ভাঙেনি কারও। ভোরের বাতাসে। আঁধার ঝোপে। রূপের নূরানী চেহারায়। সুবহে সাদিকে তিনি আগমন করলেন মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে। এ পৃথিবী যখন পাপের অন্ধকারে ভরপুর ছিল। মানবতা বিদূরিত হয়ে পশুত্বের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছিল। মানবজাতি পঙ্গপালের ন্যায় জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। গোটা বিশ্ব যেন জাহিলিয়াতের ছোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছিল। ঠিক সেই সময়ের কোনো এক রবীউল আউয়াল মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টির উপর দয়া করে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ধরার বুকে রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন। তার আগমন বিশ্ববাসীর জন্য রহমত। তিনি আরবের অসভ্য সমাজকে নতুন করে সভ্যতার আলোয় আলোকিত করলেন। মাত্র ৬৩ বছর বয়সের মধ্যে এমন এক সমাজ নির্মাণ করলেন যা শতাব্দির পর শতাব্দি মানুষের কাছে অনুসরণীয় হয়ে আছে।

আমাদের মধ্যে প্রতি বছর রবীউল আউয়াল মাস আসে যায়। এই মাস আমাদের সমস্যা বিক্ষুব্ধ বিশ্বের মানব-সমাজে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মার্জিত জীবনবোধ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে কলুষমুক্ত করতে পারি। অশান্ত পৃথিবীকে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিতে আমাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শের কাছে ফিরে যেতে হবে।

বন্দুরা! চলো নবী আগমনের এ মাসে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। আমরা যেন প্রিয়নবীর নির্মল আদর্শে গড়তে পারি আমাদের জীবন। সেই প্রত্যাশায় আজ ইতি টানলাম।

ইতি

তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. Gen-Z এর জন্মকাল কত সাল থেকে কত সাল?
২. আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ এর লেখক কে?
৩. সুলতান মাহমুদ গজনভী কবে মৃত্যুবরণ করেন?
৪. কতটি যুদ্ধে নবীজি (সা.) নিজে অংশগ্রহণ করেছেন?
৫. বালাগাল উলা বিকামালিহী নাতে রচয়িতা কে?

গত সংখ্যার উত্তর

১. ইমাম আলী ইবন আবী বাকর আল হাইসামী (র.)
২. কিয়ার স্টারমার
৩. ১৭ জুলাই ২০২৪
৪. প্রেটো
৫. ৪৫ ফুট

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]

মো. ফাহিমুল হাসান, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া হাফিজিয়া দাখিল মাদরাসা, বারহাল, জকিগঞ্জ, সিলেট # মো. কামরুল হাসান, মুরারিচাঁদ কলেজ, টিলাগড়, সিলেট # কামরুল ইসলাম, সঈদপুর বাজার ফাজিল ডিগ্রি মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # মুহাম্মদ শাহাব উদ্দীন শামীম, গাজীপুর দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সুমানা আক্তার, সাগরনাল সিনিয়র আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মো. আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোছা. ছাদিয়া জান্নাত উর্মি, ঘাটপার, চরমহল্লা বাজার, ছাতক, সুনামগঞ্জ # তানভীর হাসান রুহান, জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোহা. আব্দুল মান্নান, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # তানজিনা রহমান ইমরা, হলিয়ারপাড়া সুন্নিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ # তাসলিমা আক্তার, আল আমিন নার্সিং কলেজ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # জাসলিমা আক্তার, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # নূর আহমদ রাহাত, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রেদওয়ান আহমদ রমজান, গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বালাউট, জকিগঞ্জ, সিলেট # আব্দুল্লাহ আল মুসাদ্দিক, দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা।

শব্দকল্প

১	২		৩			৪
৫						
		৬			৭	
	৮				৯	
১০						

সূত্র : পাশাপাশি

১। বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম ৫। অধুনালুপ্ত পারস্যের শাসকের উপাধী ৬। সত্য কথা বলে যে ৯। আবরণ, স্তর ১০। জলের প্রবাহ।

সূত্র : উপর-নীচ

১। পূর্ব-উত্তর কোণ ২। শরীর ৩। সৌন্দর্য, কমনীয়তা ৪। সাহসী যোদ্ধা ৭। প্রদীপ ৮। পানি।

গত সংখ্যার সমাধান

কো	টা	আ	ন্দো	ল	ন
		স			ক
আ	মা	মা		ফাঁ	শি
ন	তু	ন	ত্ব		কাঁ
	ল			প্র	থা

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী
মো. নাছির উদ্দিন তালহা
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)

মুহাম্মদ শাহাব উদ্দীন শামীম, গাজীপুর দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সুমাইয়া আক্তার, দিনারপুর কলেজ, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # রাইয়ান আহমদ, পিডিবি উচ্চ বিদ্যালয়, বাগবাড়ী, সিলেট # মো: মাজিদুর রহমান, তেতইগাঁও রশিদ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ ভানুবিল, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # রোমান আহমেদ, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সাদিয়া জান্নাত, ভুকশিমইল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মাহবুবা জান্নাত সামিয়া, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রেদওয়ান আহমদ রমজান, গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বালাউট, জকিগঞ্জ, সিলেট # আবু সালেহ রিয়াদ, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মুহাইমিন চৌধুরী তালহা, ক্যাপ্টেন একাডেমি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # জাসলিমা আক্তার, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # নূর আহমদ রাহাত, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট।

সুডোকু

2		1	
	1		
		4	
1			3

সমাধানের নিয়ম

এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৪ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ২×২ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৪ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো একবার থাকে।

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের সমাধান

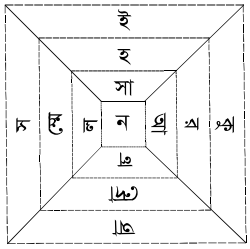

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী
আজিম উদ্দিন মাছুম
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

মুহাম্মদ শাহাব উদ্দীন শামীম, গাজীপুর দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জামিয়া আক্তার, দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসা, ঢেমরা, ঢাকা # সুমানা আক্তার, সাগরনাল সিনিয়র আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মিতু ইয়ান,সাহাব উদ্দিন হযরত শাহ খাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # তাসনিয়া জান্নাত,কাড়েরা, ছকাপন, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আশিকুর রহমান, জামকান্দি, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মো. লালন আহমদ রাজু, দ্বীনেরটুক দারুল কুরআন আলিম মাদরাসা, দোয়ারা বাজার, সুনামগঞ্জ # কাজী মো. জাকির হোসেন, সদরঘাট (কাজী বাড়ি), নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # জামিয়া আক্তার, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # ছামির আল হাসান, বীরেন্দ্র নগর স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা, দোয়ারা বাজার, সুনামগঞ্জ # তাসলিমা আকতার, কমলগঞ্জ সরকারি গণমহাবিদ্যালয়, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জাসলিমা আক্তার, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মাহবুবা জান্নাত সামিয়া, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রেদওয়ান আহমদ রমজান, গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বালাউট, জকিগঞ্জ, সিলেট # আবু সালেহ রিয়াদ, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মুহাইমিন চৌধুরী তালহা, ক্যাপ্টেন একাডেমি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।

অদ্ভুত পৃথিবী

ডেনসিয়া ল্যান্ডস্কেপ



ঝাংয়ে ডেনসিয়া ল্যান্ডফর্ম পাহাড়টি চীনের গানসুতে ঝাংয়ে ন্যাশনাল জিওপার্কে অবস্থিত। দেখতে এই পাহাড়টি বেশ রঙিন এবং পাথরের স্তর বিশিষ্ট। এই পাথরগুলো ২৪ মিলিয়ন বছর ধরে জমা পরে আছে বলে এমন স্তর বিশিষ্ট রঙিন আকৃতির হয়েছে। বায়ুজনিত কারণ, বৃষ্টি এবং সময়ের সাথে টেকটোনিক প্লেটগুলির স্থানান্তরের ফলে এই অত্যন্ত সুন্দর ল্যান্ডফর্ম এবং কাঠামো তৈরি হয়। এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক বিস্ময় হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও এটি একটি আলোচিত পর্যটন কেন্দ্র। সারা বছরই এখানে ভিড় প্রায় লেগেই থাকে বলা চলে।

হাসতে জানি

দুষ্টামি করিসনি তো?

বাবা : আজ স্কুলে দুষ্টামি করিসনি তো?
ছেলে : না বাবা, ক্লাসে আজ পুরো সময় কান ধরে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়েছিলাম! দুষ্টামি করার সুযোগই পাইনি!

একটি অঙ্কও তো হয়নি!

গণিত ক্লাসে স্যার অঙ্ক খাতা দেখতে গিয়ে রেগে চোখ লাল করে জনৈক ছাত্রকে লক্ষ করে বললেন, কী রে, তোর একটি অঙ্কও তো হয়নি!
ছাত্র : একি বলেন স্যার! একটি অঙ্কও হয়নি?
স্যার : না, তোর একটি অঙ্কও হয়নি। তাই আগামীকাল আমি তোর বাপের কাছে যাব।
ছাত্র : আব্বার কাছে যাবেন? তাহলে কালকে কেন, এখনই চলেন। আব্বা তো খুব বড় বড় কথা বলে, তিনি নাকি ভালো ছাত্র ছিলেন। তার রোল নম্বর এক ছিল।
স্যার : তোর বাপ ভালো ছাত্র ছিল তা শুনিয়ে কাজ হবে না। যখন যাব তখন বুঝবি মজা।
ছাত্র : আমি কী মজা বুঝব, অঙ্ক কী আর আমি করেছি?
স্যার (আশ্চর্য হয়ে) : তাহলে কে করেছে?
ছাত্র : অঙ্ক তো সব আব্বা করে দিয়েছেন!

এসি অন করি

হাসান : বাবলু, তোর গরম লাগলে তুই কী করিস?
বাবলু : কী আবার করব! এসির পাশে গিয়ে বসে পড়ি।
হাসান : তাতেও যদি তোর গরম না কমে?
বাবলু : তখন এসি অন করি।

মো: আনোয়ার হোসাইন
প্রভাষক (অর্থনীতি), স্কলার্সহোম মেজরটলা কলেজ, ইসলামপুর, সিলেট

আবাবিল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩৪৬৩. মুহসিনা জান্নাত তায়্যিবা
পিতা: মাওলানা মো. হাবীবুর রহমান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ছহিফাগঞ্জ এসডি দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: রহিমপুর
ডাক: ইসলামাবাদ
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩৪৬৪. মুরশিদা জান্নাত তাসনীম
পিতা: মাওলানা মো. হাবীবুর রহমান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ইসহাক একাডেমি
গ্রাম: রহিমপুর
ডাক: ইসলামাবাদ
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩৪৬৫. নাফিসা বিনতে ইমরান
পিতা: আশরাফুল ইসলাম ইমরান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: পানিগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রাম: পানিগাঁও
ডাক: রাখালগঞ্জ
থানা: দক্ষিণ সুরমা
জেলা: সিলেট

৩৪৬৬. নাজিফা জান্নাত
পিতা: সাব্বির আহমদ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ডুংশ্রী তাহফিমুল কুরআন মাদরাসা
গ্রাম: ডুংশ্রী
ডাক: মোগলাবাজার
থানা: দক্ষিণ সুরমা
জেলা: সিলেট

৩৪৬৭. হামিদা মাহমুদা সুমা
পিতা: হাফিয মুজিবুর রহমান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: কামালবাজার ফাযিল মাদরাসা
গ্রাম: শৈষ্যউড়া
ডাক: কামালবাজার
থানা: দক্ষিণ সুরমা
জেলা: সিলেট

৩৪৬৮. সামী আল সাইফ
পিতা: মো: জিয়াউর রহমান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: কামারকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রাম: কামারকান্দি
ডাক: কুলাউড়া
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

৩৪৬৯. সাবিহা মুশতারী চৌধুরী
পিতা: শামসুল কবির চৌধুরী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: বড়কাপন আটগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: ভাদেশ্বরি
ডাক: বড়কাপন
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৪৭০. সাহিদ আহমদ চৌধুরী
পিতা: ইন্তাজ আলী চৌধুরী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: বাদে ভুকশিমইল মোহাম্মদীয় দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: শশারকান্দি
ডাক: ভুকশিমইল
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

৩৪৭১. আশরাফ মাহমুদ সাবির
পিতা: আনোয়ার আলী বাবুল
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: বিশ্বনাথ দারুল উলূম ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা
গ্রাম: পুরান সিরাজপুর
ডাক: বিশ্বনাথ
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১১ রবিউল আউয়াল
রবিবার, সকাল ১০টা

জমায়েতের স্থান
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ
ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা প্রাঙ্গণ
সোবহানীঘাট, সিলেট

عيد ميلاد النبي مبارك

ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষ্যে

মুবারক র‍্যালি

চক্‌মকিয়ে উঠ্‌ল জ্বলে বিশ্বলোকের ভাগ্য-তারা
মানব-রতন নবী যখন এলেন ধরায় জাগলো সাড়া।
বিশ্ববাগের কুসুম কলি ঝরলো যখন হিমেল ঝড়ে
এলো নবীন বসন্ত ফের আসলে নবী ধরার পরে।

-আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)
-কাব্যানুবাদ: মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান

এ মুবারক র‍্যালিতে
সর্বস্তরের আশিকানে রাসূল
ছাত্র-জনতার উপস্থিতি
কামনা করছি

বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া

ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম র‍্যালি বাস্তবায়ন কমিটি সিলেট

আলিম ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাসে

আলিম জামাতে

ভর্তি চলছে

সীমিত আসন

আমরা ভিন্ন কেন?

- আলিম ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাস।
- সম্পূর্ণ আবাসিক ও সার্বক্ষণিক তদারকি।
- ইলম অর্জনের পাশাপাশি আমলে অভ্যস্ত করণের পরিবেশ।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ।

যোগাযোগ

01700-842680, 01772-959072
01712-904501, 01737-769053

হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ

কলেজ রোড, কদমতলী, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

দারুল হিকমাহ একাডেমি কমলগন্জ

বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভর্তি
- ইসলামি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাদান
- সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, নিয়মিত মডেল টেস্ট
- কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ
- নিরিবিলি পরিবেশে শিক্ষাদান
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান
- গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত ক্লাসের পড়া ক্লাসেই হাতে কলমে শেখানো ব্যবস্থা
- ইংরেজি ও আরবি স্পোকেন এর ব্যবস্থা
- নিয়মিত আখলাকী তা'লীম প্রদান
- সনদপ্রাপ্ত ক্বারীগণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ প্রশিক্ষণ
- শিক্ষার মানোন্নয়নে ত্রি-পক্ষীয় (শিক্ষক-অভিভাবক- পরিচালনা পরিষদ) বৈঠক
- রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা
- ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা, বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, শিক্ষা সফর ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ
- সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার
- গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ

নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা

প্লে শ্রেণি থেকে স্ট্যান্ডার্ড ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : মো. আতিকুর রহমান সাকের

সীমিত আসন

স্বল্প বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ

ক্যাম্পাস | আলেপুর (আদমপুর রোড, চেকপোস্ট-এর দক্ষিণ পার্শ্বে) কমলগন্জ, মৌলভীবাজার।

যোগাযোগ: ০১৭১২-৬৮৬২৮২, ০১৭১২-৭৬৭২৮৪

আপনি কি ২০২৩, ২০২৪, ২০২৫ সালের মধ্যে

হজ্জ করতে চান?

মাত্র ৩১,০০০ টাকা জমা দিয়ে আজই প্রাক নিবন্ধন করুন

ওমরাহ স্পেশাল প্যাকেজ

"আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিনা তবে আমরা ব্যতিক্রম"

স্বত্বাধিকারী

আলহাজ্জ মাওলানা খাজা মঈনউদ্দীন আহমদ জালালাবাদী

+88 01711 838 624

জালালাবাদ হজ্জ কাফেলা

Khaja Air Liner

খাজা

Khaja

air Liner

Travel & Tours

হজ্জ ওমরাহ গ্রুপ

আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট এন্ড টুরস

Govt. Licn. No :253, 511, 882

IATA ACCREDITED AGENT

Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED

TURKISH AIRLINES

BRITISH AIRWAYS

Emirates

QATAR AIRWAYS

SINGAPORE AIRLINES

US-BANGLA AIRLINES

REGENT

NOVOAIR

আমাদের নিজস্ব স্টক হতে সর্বনিম্ন মূল্যে বিশ্বের যে কোন গন্তব্যের বিমান টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

সিলেট অফিস

সবুজ বিপনী (৩য় তলা) জিন্দাবাজার

01724 926 329, 01714 486796

www.khajaairliner.com

ঢাকা অফিস

হোটেল বকসি (২য় তলা). ফকিরাপুল

01724 691 177, 0248 313524

khajaairliner@yahoo.com

আল মারওয়ান ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস্

হজ্জ লাইসেন্স নং-১৫১২ | সরকার অনুমোদিত হজ্জ ও ওমরাহ্ এজেন্ট | ওমরাহ্ লাইসেন্স নং-২৫৮

হজ্জ ও ওমরাহ্ বুকিং চলছে

হজ্জের প্রাক নিবন্ধন চলমান

ওমরাহ্ ইকোনমি প্যাকেজ

- ভিসা, এয়ার টিকেট
- হারাম শরীফ থেকে ৫-১০ মিনিটের দূরত্বে হোটেল
- মসজিদ-এ নববী থেকে ৫-৭ মিনিটের দূরত্বে হোটেল
- মক্কা ও মদিনায় ট্রান্সপোর্ট
- নিজস্ব হোটেলে উন্নতমানের বাংলা খাবারের ব্যবস্থা
- গাইড দ্বারা সার্বক্ষণিক সেবা

ওমরাহ্ ভি.আই.পি প্যাকেজ

- ভিসা, এয়ার টিকেট
- হারাম শরীফ ও মসজিদ-এ নববীর নিকটবর্তী ৪স্টার/৫স্টার হোটেল
- মক্কা ও মদিনায় ট্রান্সপোর্ট
- নিজস্ব হোটেলে উন্নতমানের বাংলা খাবারের ব্যবস্থা
- গাইড দ্বারা সার্বক্ষণিক সেবা

IATA ACCREDITED AGENT

Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED

ATAB

ভারত এবং বাংলাদেশের যেকোনো এয়ারলাইন্সের অভ্যন্তরীন (Domestic) টিকেট পাওয়া যায়।

আমাদের সেবাসমূহ

- হজ্জ ও ওমরাহ্ সার্ভিস
- সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং
- এয়ার টিকেট
- সৌদি আরবে নিজস্ব মোয়াল্লেম দ্বারা হজ্জ-ওমরাহ্ পরিচালনা করা
- প্রয়োজনে হুইল চেয়ারে যাত্রী বহন
- ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান

রশিদ এম্পোরিয়াম (২য় তলা), দরগাহ গেইট, সিলেট-৩১০০, বাংলাদেশ

মোবাইল: ০১৭৩৭৮১৫৫৮০, ০১৬১১৪৮০৪৮০, ০১৭৪৭৫১৫১৫১

লতিফিয়া হিফযুল কুরআন একাডেমি ওসমানীনগর
LATIFIA HIFZUL QURAN ACADEMY OSMANINAGAR

(একটি অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন আবাসিক হাফিজিয়া মাদরাসা)

বৈশিষ্ঠাবলী

- সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থাপনা
- সুন্নতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান
- কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক
- প্রবাসী ও দুরবর্তী ছাত্রদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ
- ছাত্রদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চার সুযোগ-সুবিধা
- বোর্ড পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনের নিশ্চয়তা
- সর্বোচ্চ তিন বছরে হিফজ সম্পন্ন করার নিশ্চয়তা (ইনশা আল্লাহ)
- একাধিক ক্লাস টেস্ট ও বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট গ্রহণ
- পাঁচ বছরে দাওরাসহ ইবি, জে.ডি.সি ও দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ ও বিজ্ঞান শাখায় পাঠদানের ব্যবস্থা
- প্রতিভা বিকাশের লক্ষে সাপ্তাহিক সেমিনার, সবিনা, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও দেয়ালিকা প্রকাশ



সফলতার ১১ বছর

ভর্তি চলছে

বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ সফলতা

প্রতিবছর
- ১লা ডিসেম্বর থেকে ভর্তি শুরু
- ২রা জানুয়ারি মেধা যাচাই পরীক্ষা
- নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রদের ৫ জানুয়ারি হোস্টেলে আগমন
- ১লা জানুয়ারি থেকে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু

ক্যাম্পাস | দক্ষিণ তাজপুর, ওসমানীনগর, সিলেট

যোগাযোগ
মাওলানা এম.এ রব প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও প্রিন্সিপাল
মশাহিদুর রহমান প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
০১৭১৬-৯৩৯৯১৮, অফিস: ০১৭৮৫-১২৮১২৮
E-mail: moshahidurrahman@yamail.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মো. একলাছুর রহমান
সত্ত্বাধিকারী
মোবাইল: ০১৭৩৩-৯৪০৮৪০

মেসার্স

প্রীতি আয়রণ এন্ড স্টীল

এখানে ফ্লেট বার, জেড বার, এঙ্গেল এম.এস শিট
এম.এস পাইপ ইত্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

মোবাইল দোকান: ০১৭১১-৮৪৭৪৯৫

৭৭২/৫ ঢাকা-সিলেট রোড (বেড়িরপার), মৌলভীবাজার-৩২০০

লতিফ ট্রাভেলস

লতিফ হলিডেইজ

IATA ATAB TAAB

প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের ৬১ লতিফ ট্রাভেলস স্থাপিত : ১৯৬২

হজ্জ লাইসেন্স নং-২৪৯ | ওমরা লাইসেন্স নং-৩১২

হজ্জ ও ওমরা এজেন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
হজ্জ নীতিমালা অনুযায়ী (ক্রমিক নং অনুযায়ী হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করা হবে) পরবর্তী হজ্জের জন্য
হজ্জ রেজিস্ট্রেশন চলছে হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করতে আপনার
নিকটবর্তী আমাদের যেকোন শাখায় রেজিস্ট্রেশনের আজই যোগাযোগ করুন -

এয়ার টিকেট
প্যাকেজ ট্যুর
ম্যানপাওয়ার
ভিসা প্রসেসিং

হযরত শাহজালাল রোড। দরগা গেইট
হোটেল হলি ইনের পার্শ্বে। সিলেট।
০১৯৭৩৩৩০৭২৯। ০১৩১৮২১০০৭৩

১১৯-১২৪ আর.বি কমপ্লেক্স
(নীচ তলা) । পূর্ব জিন্দাবাজার । সিলেট
০৮২১-৭১৪৩২২ ০১৭১১ ৩৩০ ৭২৯
latiftravels1962@gmail.com

ষ্টেশন রোড। ভার্থখলা। সিলেট
০৮২১-৭১৭৪৩৭। ৭১৪৪৭৬। ৭১৫২৪৩
০১৭১১ ০০৬ ১০৫। ০১৮৪৬ ৩৯০ ৭৮৪
latiftravels@hotmail.com

১০৪-১০৯ রোজ ভিউ কমপ্লেক্স
(নীচতলা)। শাহজালাল উপশহর। সিলেট
০৮২১ ৭২৪০০৭ ০১৭১১ ৩২২২৪৪
latiftravels@gmail.com

বিয়ানীবাজার : হাজী সিরাজ ভবন, ২য় তলা কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার। ০১৭৭১ ১৪৪ ৬৬৬
বড়লেখা : হাবীব মার্কেট (২য় তলা), পূবালী ব্যাংক সংলগ্ন, বড়লেখা। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫০
মৌলভীবাজার : কুসুমবাগ শপিং সিটি (নীচতলা), কুসুমবাগ, মৌলভীবাজার। ০১৭১২ ৬৮৭ ৮৭১
শমশের নগর : এম কে রহমান ট্রেড সেন্টার, ষ্টেশন রোড, শমশের নগর। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫৫
ঢাকা কর্পোরেট : হক চেম্বার, (৫ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা। ০১৯১২ ৫৭৭ ৪২৩

বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে টিকেটের সঠিক মূল্য জানুন,
ঘরে বসে নিজের টিকেট নিজেই বুকিং করুন - লতিফ ট্রাভেলস পোর্টালের মাধ্যমে
Ticketing Portal : www.latiftravels.net

latiftravels.com.bd latiftravels.com @Latiftravelsroseview

নকশি

এক্সক্লুসিভ কালেকশন

আর এম সিটি শপিং মল
কুলাউড়া
Nakshi Exclusive

মেসার্স
হাজী আলাউদ্দিন ট্রেডার্স



উত্তর বাজার, কুলাউড়া

মাথা



কুলাউড়া শপিং কমপ্লেক্স (নিচতলা)
কুলাউড়া

প্রোঃ আফজাল হোসেন সাজু ০১৭৪৪-৮১৫০৬৯

LATIFI HANDS

FULTALI SAHEB BARI, ZAKIGANJ, SYLHET, BANGLADESH

OUR PROJECTS

- EDUCATION
- ORPHANS
- HOUSING PROJECTS
- MASJID PROJECTS
- INFRASTRUCTURE
- SUSTAINABLE LIVELIHOODS
- AGRICULTURE SUPPORT
- WEEDING SUPPORT
- SADAQAH PROJECT
- HEALTH CARE
- EYE CARE
- GIFT
- QURBANI PROJECT
- EMERGENCY AND DISASTER RELIEF
- BLIND AND DISABLED PROJECT
- WATER PROJECT
- WIDOW SUPPORT

www.youtube.com/latifihands
www.facebook.com/latifihands

www.latifihands.org.uk

বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা
সর্বোচ্চ মান নিয়ে আমরা আছি আপনার পাশে



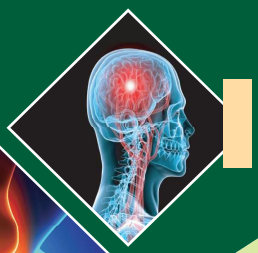





- আই.সি.ইউ
- এন.আই.সি.ইউ
- পি.আই.সি.ইউ
- পি. এইচ. ডি. ইউ
- সি.সি.ইউ, এইচডিইউ
- ডেন্টাল কেয়ার
- জেনারেল সার্জারী
- ডায়ালাইসিস ইউনিট
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা
- ২৪ ঘন্টা ফার্মেসী বিভাগ
- ২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগ
- মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার
- ২৪/৭ ডায়াগনস্টিক সার্ভিস
- আই.সি.ইউ এম্বুলেন্স সার্ভিস
- ইনফার্টিলিটি (বন্ধ্যাত্ব) কেয়ার।

ওয়েসিস হসপিটাল
সোবহানীঘাট, সিলেট

Subhanighat, Sylhet

E-mail: oasishospitals@gmail.com, info@oasishospitalbd.com, Cell: 01611-990000, 01763-990055

Al ISLAH
CASH & CARRY



CASH & CARRY AND WHOLESALE
OPEN TO THE PUBLIC
CATERERS ONESTOP SHOP
LARGE PARKING

WE SPECIALIZE IN FULL CATERING SUPPLIES
WE SPECIALIZE FOR YOUR FULL PACKAGING SUPPLIES
RICE, FLOUR, SPICES, TIN PRODUCT, PAULTRY, LAMB, MUTTON

290-294, BISCOT ROAD
LUTON, LU3 1AZ

01582 414154
07769 778127